হামবার্ট
ও
দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

হামবার্ট ও দস্যু বনহুর-৬৫

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুরের দু'হাতে দুটি রিভলভার। সমস্ত শরীরে জমকালো পোশাক। মাথায় পাগড়ি, পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা।

চোখ দু'টো মশালের আলোতে যেন জ্বলছে। পায়ে হাটু অবধি ভারী বুট।

হামবার্ট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—এখানে কি করে প্রবেশ করলে?

কয়েক পা সরে আসে বনহুর তারপর বলে—যাদু মন্ত্রের দ্বারা এখানে প্রবেশ করেছি!

জানো তুমি কোথায় এসেছো?

জানি—শিয়ালের গর্তে.......

হিংস্র জানোয়ারের মত গর্জে উঠে হামবার্ট—কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছো জাননা দস্যু বনহুর?

তুমিও জানতেনা কার সঙ্গে কথা বলছো, যদি ওরা আমার পরিচয় না দিতো। শোন হামবার্ট, তোমার জঙ্গল বাড়ির ঘাটির কাজ শেষ হয়ে গেছে তাই আমি এসেছি তোমায় ছুটি দিতে।

ছুটি দিতে! আমাকে?

হাঁ—কেনো বিশ্বাস হচ্ছেনা? হামবার্ট তোমার কু'কীর্তি কান্দাই বাসীর কাছে অজ্ঞাত থাকলেও আমার কাছে গোপন নেই। তুমি সুদূর জিহাংহা থেকে কান্দাই এসেছো, রক্ত আর চক্ষু ব্যবসা চালাতে কিন্তু..... আর নয়!

হামবার্টের চোখ দু'টো বিস্ময় বিস্ফারিত হয়ে উঠে। রক্ত আর চক্ষু ব্যবসা সম্বন্ধে দস্যু বনহুর জানলো কি করে। আর তারা যে সুদূর জিহাংহা থেকে কান্দাই এসেছে শুধু এই ব্যাপারে তাও যে জানে এমন কি তার নামটাও অজানা নেই ওর কাছে।

হামবার্ট ধীরে ধীরে পিছু হটে একটা সুইচে হাত দিতে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর সেখানে এসে দাঁড়ায়—খবরদার এতে হাত দিওনা....

ঐ মুহূর্তে হামবার্টের সঙ্গীদ্বয় নীলাকে ধরে ওদিকে টেনে নিয়ে যায়।

সেই দণ্ডে বনহুরের দক্ষিণ হস্তের রিভলভার গর্জে উঠে। এক সঙ্গে দুটো গুলির শব্দ হয়।

হামবার্ট তাকিয়ে দেখে নীলার দু'পাশে দু'জন ঢলে পড়েছে।

নীলা ছুটে এসে পিতার বুকে মাথা রাখে—আব্বু.....

আমির আলী সাহেবের হাত দু'খানা বাঁধা থাকায় তিনি কন্যাকে কাছে টেনে নিতে পারেন না। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছেন শুধু। এমন ভাবে হঠাৎ দস্যু বনহুর এসে নীলাকে শয়তান হামবার্টের কবল থেকে উদ্ধার করবে ভাবতে পারেন নি।

নীলাও কেমন যেন হতভম্ভ হয়ে পড়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারছেনা। সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তার কাছে। নীলা পিতার পাশে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছে দস্যু বনহুরের দিকে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে ওর চোখ দুটো।

হামবার্টের সঙ্গীদ্বয় গুহার মেঝেয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গুহার পাথুরে মেঝেটা। হাত পা নাড়া দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলো দেহ দু'টো।

হামবার্ট সঙ্গীদ্বয় এর মৃত্যুতে একটুও ঘাবড়ালোনা।

সে শুধু একবার লাশ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে আবার তাকালো দস্যু বনহুরের মুখে।

বনহুর গুহার মুখে দাঁড়িয়ে না থাকলেও তার বাম হাতের রিভলভারখানা গুহার মুখ লক্ষ্য করে ধরে ছিলো যাতে হামবার্ট এগুতে না পারে।

হামবার্ট এবার এগুতে থাকে বনহুরের দিকে।

বনহুরও এগোয়।

আচমকা হামবার্ট কোমরের বেলট থেকে একখানা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা খুলে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর চট করে সরে দাঁড়ালো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হামবার্ট গুহার দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

বনহুর ফিরে তাকিয়ে দেখলো হামবার্ট নেই। আশ্চর্যভাবে সে উধাও হয়েছে। গুহার দেয়ালে সে যেন যাদু মন্ত্রের মত মিশে গেছে।

এক দণ্ড বিলম্ব না করে বনহুর আমির আলী এবং নীলাকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা শীঘ্র আমাকে অনুসরণ করুন.... এই মুহূর্তে হামবার্ট তার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে ফেলবে।

বনহুর গুহায় মুখ অভিমুখে অগ্রসর হলো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা জমকালো ছায়ামূর্তি দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে যতদূর সম্ভব দ্রুত গুহা থেকে সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পর্বতমালা দুলে উঠলো।

বনহুর বললো—আপনারা ছুটতে শুরু করুন আর এক দণ্ড বিলম্ব হলে কেউ জীবিত থাকা সম্ভব হবে না....

নিজেও বনহুর ছুটতে লাগলো।

একটি সুড়ঙ্গ মুখ থেকে বেরিয়ে অপর একটি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলো বনহুর আমির আলী সাহেব এবং নীলা।

সেই মুহূর্তে ভীষণ একটি শব্দ হলো।

বনহুর বললো—মাটিতে উঁবু হয়ে শুয়ে পড়ুন আপনারা..... নিজেও বনহুর মাটিতে উঁবু হয়ে শুয়ে পড়লো।

ততক্ষণে সমস্ত পর্বতটা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধ্বসে পড়লো।

বড় বড় পাথরের চাপ তাদের চারিদিকে পড়তে লাগলো। সেকি ভীষণ ভূমিকম্পন যেন সমস্ত পৃথিবীটা আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চললো এই ধ্বংস লীলা। জংগল বাড়ি ঘাটি শুধু পাথর স্তূপে পরিণত হলো। নীলা আর আমির আলী সাহেব তো সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার উপক্রম। তারা জীবিত আছে না মরে গেছে ভেবে পেলোনা।

যখন ভূমিকম্পন বন্ধ হয়ে এলো তখন চারিদিকে পাথর ধ্বসে পড়াও থেমে গেছে।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

প্রথমে সে আমির আলী সাহেবকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো—আর ভয় নেই খান বাহাদুর সাহেব এবার আপনারা মুক্ত.....

নীলা তখনও পড়েছিলো মাটিতে উবু হয়ে। তার সংজ্ঞা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

বনহুর নীলাকেও তুলে ধরলো—উঠুন বিপদ কেটে গেছে....

নীলা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। অসহায় করুণ সে দৃষ্টি যদিও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু বেশ বোঝা যাচ্ছিলো।

হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিলো তার।

আমির আলী সাহেবের অবস্থাও তাই। তিনি বৃদ্ধ অবস্থা, তার হাত দু'খানা ফুলে উঠেছে রীতিমত।

বনহুর বললো—আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন কারণ আপনারা হামবার্টের আয়ত্বের বাইরে এসে গেছেন।

আমির আলী সাহেব আর নীলা অন্ধকারে বনহুরের দিকে তাকালো, এই বিপদ মুহূর্তে দস্যু বনহুরকে তাদের পরম বন্ধু জন বলে মনে হলো। যে দস্যু বনহুরের নাম স্মরণ করলে তাদের হৃদকম্প শুরু হয় আজ সে যেন কত আপন জন।

আমির আলী সাহেব প্রায় কেঁদে ফেললেন, বললেন তিনি—আপনাকে আমি কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো......

একটু হাসলো, বনহুর তারপর বললো—ধন্যবাদের কোন প্রয়োজন নেই খাঁন বাহাদুর সাহেব তা ছাড়া আপনি নয় তুমি বলেই আমাকে সম্বোধন

করবেন কারণ দস্যু বনহুরকে কেউ কোনদিন আপনি বলে সম্মান দেখায় না। হাঁ এবার আপনারা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করুন।

আমির আলী সাহেব কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন—এসো মা।

নীলার কণ্ঠ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে পিতার কথায় কোন জবাব দিতে পারলোনা বা অগ্রসরও হলোনা।

বনহুর নীলার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বললো—ভয় নেই আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।

এসো মা নীলা, এসো। যে তোমাকে নরপশু শয়তানটার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিলো সে আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা।

বনহুর এগিয়ে চললো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা তাকে অনুসরণ করে।

বারবার হোঁচট খাচ্ছিলো নীলা।

আমির আলী সাহেবও পড়ে যাচ্ছিলেন মাঝে মাঝে।

বনহুর বললো,—আপনারা সাবধানে ধীরে ধীরে চলুন। যে সুড়ঙ্গ পথে চলেছেন এপথ হামবার্টের নয় কাজেই আপনারা ধীরে ধীরে চলুন।

আমির আলী সাহেব হাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—এ সুড়ঙ্গ পথ কার তবে?

বনহুর বললো—আমার।

তোমার?

হাঁ। চলুন....

আমির আলী সাহেব আর নীলা পুনরায় চলতে শুরু করে।

বেশ কিছু সময় তারা নীরবে চলতে থাকে। আমির আলী সাহেব আর নীলা অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিলো। ওরা ধীরে ধীরে এগুচ্ছে বনহুরও ওদের সংগে আস্তে আস্তে চলছিলো।

কোন কোন সময় সুড়ঙ্গ পথে ঠেশ দিয়ে ওরা বিশ্রাম করে নিচ্ছিলো।

পিপাসায় নীলার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে।

এক সময় বললো নীলা—পানি। একটু পানি দেবে আমাকে?

বনহুরের মায়া হলো কারণ নীলার চলতে বড্ড কষ্ট হচ্ছিলো তারপর পিপাসায় কাতর সে। বনহুর বললো—আরও কিছুক্ষণ কষ্ট করতে হবে। এই সুড়ঙ্গ মধ্যে পানি পাওয়া মুস্কিল।

আবার ওরা চলতে থাকে।

কিন্তু বেশিক্ষণ আর হাটতে সক্ষম হয় না তারা। বসে পড়েন আমির আলী সাহেব। নীলাও ঢলে পড়ে যেন, একে সে ক্লান্ত অবসন্ন তারপর অত্যন্ত পিপাসায় কাতর।

আমির আলী সাহেব বললেন—আর চলতে পারছি না.....একটু ঘুমাবো।

বনহুর বললো—আপনারা ঘুমিয়ে নিন। আমি আবার আসবো।

আমির আলী সাহেব বা নীলা কোন জবাব দেবার পূর্বেই বনহুর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়ে পিতা আর কন্যা।

❑

ভোরে ঘুম ভাংতেই আমির আলী সাহেব চোখ মেলে আশ্চর্য হলেন। তিনি তার বিছানায় শুয়ে আছেন। তার নিজের শয়ন কক্ষ সেটা। কি করে এখানে এলেন ভেবে পাননা।

গত রাতের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে তার। ফিরু গাঁয়ের ডাক বাংলো থেকে হামবার্টের দু'জন অনুচর তাদের বন্দী করে নিয়ে যায় হামবার্টের জংগল বাড়ি ঘাটিতে। তারপর নীলাকে আচমকা আক্রমণ করে বসে হামবার্ট। নীলার তীব্র করুণ আর্তনাদ, আব্বু বাঁচাও...... পরক্ষণেই বিস্ময় ভরা এক অদ্ভুত কাণ্ড। যাদু মন্ত্রের মত আবির্ভূত হলো দস্যু বনহুর। হামবার্টের কবল থেকে উদ্ধার পেলো নীলা। তারপর দস্যু বনহুর আর হামবার্টের মধ্যে তর্ক বিতর্ক। হঠাৎ হামবার্টের পলায়ন পরপর সমস্ত পর্বতমালা কম্পন, প্রচণ্ড একটা শব্দ তার পর ধ্বংসলীলা.....

সব কথা মনে পড়ে আমির আলী সাহেবের, সেই সুড়ংগ পথ, যে পথে দস্যু বনহুর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলো। দস্যু বনহুরের অনুগ্রহে তারা পিতা পুত্রি জীবনে বেঁচে আছে। হামবার্ট তাদের সবাইকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তার জংগল বাড়ি ঘাটির ধ্বংস সুইচ টিপে দিলো চারিদিকে ধ্বসে পড়া পাথর খণ্ডের স্তূপ, তার মধ্য দিয়ে সুড়ংগ পথে অগ্রসর—দস্যু বনহুরের সহানুভূতি সূচক বাণী-------

হঠাৎ আমির সাহেবের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নীলা প্রবেশ করে সেই কক্ষে—আব্বু...

আমির আলী সাহেব বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলেন— মা নীলা তুমি!

আব্বু আমরা এখানে কি করে এলাম?

আমিও তাই ভাবছি মা। সব যেন কেমন যাদু মন্ত্রের মত লাগছে। হাত দু'খানা সম্মুখে মেলে ধরে বলেন আমির আলী সাহেব— হাতের বন্ধনই বা কি করে খুলে গেলো কিছু বুঝতে পারছিনা...

নীলাও তার নিজের হাত দু'খানা সম্মুখে তুলে ধরে দেখতে থাকে এখনও তার হাত দু'খানা লাল হয়ে আছে। কিন্তু সেই বন্ধন গেলো কোথায়, কেইবা তাদের হাত দু'খানাকে মুক্ত করে দিলো।

পিতা পুত্রি মিলে যখন বিস্ময় নিয়ে এ ওর দিকে তাকাচ্ছিলো সেই মুহূর্তে দারওয়ান এসে দাঁড়ায়। লম্বা সালাম দিয়ে বলে— মালিক আপনারা কখন এলেন? আমরা তো কিছু জানিনা।

আমির আলী সাহেব সব কথা গোপন করে বলেন—কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় রাতেই চলে এসেছি।

বৃদ্ধ দারওয়ান মালিকের কথায় খুব সন্তুষ্ট হতে পারলো না কারণ সে সমস্ত রাত সদর গেটে ভালভাবে সজাগ থেকে পাহারা দিয়েছে। কখন গাড়ি গেটে প্রবেশ করলো তারা জানে না এটা আশ্চর্যের বিষয় তবু কোন উত্তর করেনা দারওয়ান, ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় সে।

পরক্ষণেই চাকর বাকর বাবুর্চি সবাই এসে জড়ো হয়, সবার মুখে এক প্রশ্ন মালিক আপনারা কখন এলেন আমরা কেউ জানতে পারলাম না।

যে বাবুর্চি বয় এবং দারওয়ান তাদের সঙ্গে ফিরু গাঁও গিয়েছিলো তারা আসেনি কেনো এ প্রশ্নও করে বসলো চাকর বাকরের দল।

আমির আলী সাহেব প্রথমে বিব্রত হলেন পরক্ষণে নিজকে সামলে নিয়ে বললেন– তারা পরে আসবে কারণ আমরা ভাড়াটিয়া গাড়িতে এসেছি।

মালিকের কথায় আর কেউ প্রশ্ন করে না। সবাই যার যার কাজে চলে যায়।

নীলা এবং আমির আলী সাহেব যতই ভাবেন—ততই অবাক হন কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। তবে এটুকু বুঝতে পারেন তাদের এখানে এসেছে দস্যু বনহুর এবং সেই তাদের হাতের বন্ধন উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

সমস্ত দিন কেটে গেলো সন্ধ্যার কিছু পূর্বে রংলাল ফিরুগাঁও থেকে বাবুর্চি বয় এবং দারওয়ান সহ এসে হাজির হলো। রংলালই গাড়ি চালিয়ে এসেছে।

আমির আলী সাহেব রংলালকে দেখে খুশি হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—রংলাল তুমি কখন ডাকবাংলোয় ফিরে এসেছিলে?

রংলাল মাথা চুলকে বললো—বৈকালে গিয়ে দেখি আপনারা নেই দারওয়ান বাবুর্চি বয় সবাই হাত পা মুখ বাধা অবস্থায় দেখতে পাই। মালিক আমি তাড়াতাড়ি ওদের হাত পা এবং মুখের বাঁধন খুলেই দেই। তখন ওরা আমাকে জানায় দু'জন দস্যু এসে আপনাদের ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় কোন দিকে নিয়ে গেছে তারা বলতে পারে না। পরে ওদের নিয়ে চলে

এলাম....মালিক আমি কিছু বুঝতে পারছিনা, দস্যু নাকি আপনাদের দুজনাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলো তা হলে এখানে এলেন কি করে!

আমির আলী সাহেব বললেন—সে কাহিনী অতি রহস্যময়। কাউকে না বললেও তোমাকে আমি সব বলবো কারণ আমি এখন এমন একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছি যাতে আমার এবং নীলার জীবনের কোন ভরসা নেই।

অবাক কণ্ঠে বললো রংলাল—মালিক আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তুমি স্থির হয়ে বসো আমি সব বলছি। কিন্তু এসব কথা আর কাউকে বলবেনা যেন।

না মালিক বলবো না।

আমির আলী সাহেব গত রাতের সব কথা খুলে বলেন রংলালের কাছে আরও বলেন তুমি থাকলে নিশ্চয়ই শত্রু আমাদের এভাবে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে পারতো না।

রংলাল বললো—মালিক এখন থেকে আমি সব সময় আপনাদের পাশে পাশে থাকবো।

নীলা ঐ মুহূর্তে পিতার কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো তার কানে গেলো রংলালের কথাগুলো আনন্দে ভরে উঠলো ওর মন।

বনহুর পিতার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই নীলা ওর পথ রোধ করে দাঁড়ায়—মনির!

নীলা! ওর মুখটা তুলে ধরে রংলাল।

নীলার দু'চোখে অশ্রু ঝরে পড়ে।

রংলাল নীলার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে তোমার আব্বুর মুখে সব শুনেছি নীলা! চলো তোমার ঘরে যাই।

চলো! নীলা অগ্রসর হলো।

রংলালও এলো তার সঙ্গে।

নীলা উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদলো কিছুক্ষণ তারপর নিজকে সংযত করে নিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুরের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ মনির কারণ সে যদি ঐ মুহূর্তে জঙ্গল বাড়ি ঘাটির সেই গোপন গুহায় গিয়ে হাজির না হতো তাহলে.........আর বলতে পারে না নীলা।

রংলাল বললো—হাঁ তোমার আব্বুও সে কথা বললেন। তোমরা পিতা কন্যা উভয়েই দস্যু বনহুরের কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু সে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়েই তোমাদের দু'জনাকে এভাবে উদ্ধার করেছে।

উদ্দেশ্য নিয়ে সে আমাকে এবং আব্বুকে শয়তান হামবার্টের কবল থেকে উদ্ধার করেছে!

তা না হলে সে আবার আসবে বলে গেছে কেনো?

জানিনা তার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য তুমি......নীলা তোমাকে সে হয়তো চায়।

মনির।

আমার সে রকম মনে হচ্ছে। ধরো সে তোমাদের জীবন রক্ষা করেছে যদি সে তোমাকে দাবী করে বসে তা হলে কি করবে?

না না তা হতে পারে না।

তোমার আব্বু নিশ্চয়ই তোমার কোন আপত্তি শুনবে না, কারণ দস্যু বনহুর যদি ঐ সময় না গিয়ে পৌঁছতো তাহলে হামবার্টের কবল থেকে তোমরা রক্ষা পেতেনা কাজেই......

নীলা রংলালের মুখে হাত চাপা দেয়—চুপ করো, চুপ করো মনির। আমি শুনেছি দস্যু বনহুর বিপদের বন্ধু। সে প্রতিদান চায় না।

একটু হাসলো রংলাল তারপর বললো—কিন্তু আমি শুনেছি সে নাকি ভয়ঙ্কর নর হত্যাকারী এবং নারী হরণ....

মিথ্যা কথা। তুমি যা শুনেছো তা সত্য নয়।

নীলা দস্যু কোনদিন সাধু হয় না। যাক্ সে যদি তোমাদের কাছে সাধু হয় তাহলে ভাল....রংলাল কথা কয়টি বলে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

নীলা বলে...যেও না, শোন।

রংলাল থামলো।

নীলা বললো—তুমি আমার উপর অভিমান করেছো মনির?

উঁ হু।

তবে ওমন করে চলে যাচ্ছো কেনো? দস্যু বনহুর যদি আমাদের উদ্ধার না করতো তাহলে আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হতো না।

জানি।

তবে কেনো তুমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হচ্ছো মনির?

মোটেই আমি অসন্তুষ্ট নই।

তবে হাসো! নীলা রংলালের জামার আস্তিন দু'হাতের মুঠায় চেপে ধরে বলে।

নীলার কথায় রংলালের মুখে হাসি ফুটে উঠে।

নীলা ওর বুকে মুখ রেখে বলে—রংলাল তুমি বুঝবে না আমার কথা। তুমি ছাড়া আমি কিছুই বুঝি না।

নীলা এ তোমার ভুল.....

না ভুল নয়। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না মনির।

কিন্তু....

বলো?

কিন্তু দস্যু বনহুর যদি....

তুমি ও কথা বলো না। আমাকে আর ব্যথা দিও না।

বেশ আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাই না।

সমস্ত সন্ধ্যাটা নীলা আর রংলাল নানা কথাবার্তায় কাটিয়ে দেয়।

নীলা স্বাভাবিক হয়ে আসে ধীরে ধীরে।

কিন্তু আমির আলী সাহেব ভীষণ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তিনি সর্বক্ষণ নিজের কক্ষে সাবধানে বসে থাকেন। একটি মুহূর্তের জন্যও আমির আলী সাহেব তার এত সখের গবেষণাগারেও গেলেন না।

যতই রাত বাড়ছে আমির আলী সাহেব ভীত হয়ে উঠেছেন একটা দারুন দুশ্চিন্তার ছাপ তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

❑

জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি শুধু দস্যু বনহুরকে নিঃশ্চিহ্ন করার জন্য। আমি জানতাম সে কত বড় দুর্দ্দান্ত আর ভয়ঙ্কর। সেই দস্যু বনহুর আমাদের ঘাটির সন্ধান পেয়েছিলো....কথা শেষ না করেই হেসে উঠে হামবার্ট—হাঃ হাঃ হাঃ এখন তার সব দর্প সর অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে।

হামবার্টের সম্মুখে তার কয়েকজন অনুচর দাঁড়িয়েছিলো, সবার চোখে মুখে একটা বিষণ্নতার ছাপ। যেন তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে।

হামবার্টের কথায় বললো একজন---মালিক দস্যু বনহুরকে হত্যা করার জন্য আপনি কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সুনিপুন জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলেন? এতোবড় ক্ষতি.....

তুমি জানো না মোহনলাল ঐ দস্যুকে হত্যা করার জন্য কান্দাই সরকার কত কোটি কোটি টাকা নষ্ট করেছে। কত পুলিশ গোয়েন্দা অহরহ সন্ধান করে ফিরছে তাকে। আমি সেই বিখ্যাত দস্যু সর্দারকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি আমার একটি ঘাটি বিনষ্ট করে, এ আমার গর্ব।

অপর আর একজন বলে---যে নীলার জন্য আপনি এতো উন্মাদ, সে নীলাও যে মৃত্যুবরণ করলো মালিক?

হাঁ এটা আমার বড় আফসোস মাদার্ন কারণ নীলার প্রতি আমার বহু দিনের অনুরাগ। ওকে আমার নিতান্ত প্রয়োজন ছিলো......একটু থেমে আবার বললো হামবার্ট।

নীলাকে হারালাম দুঃখ হলেও নীল পাথর আমার বুকে সান্তনা যোগ্যাবে।.....

ঠিক ঐ মুহূর্তে একজন অদ্ভূত পোশাকধারী লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো—মালিক খান বাহাদুর ও তার কন্যা নীলা জীবিত...

গুহা মধ্যে যেন আচমকা বাজ পড়লো।

সবাই বিস্ময় নিয়ে তাকালো লোকটার মুখের দিকে।

হামবার্ট বলে উঠলো—খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব ও তার কন্যা নীলা জীবিত আছে।

হাঁ মালিক!

তুমি কি করে জানলে গোংলাইসিং?

বিশু সংবাদ এনেছে।

বিশু!

হাঁ মালিক।

এক্ষুণি বিশুকে ডাকো নিশ্চয়ই সে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

না মালিক সে নাকি খান বাহাদুর এবং তার কন্যা নীলাকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে...

বলো কি গোংলাইসিং! গর্জে উঠে হামবার্ট।

গোংলাই এর মুখ শুকিয়ে গেলো কারণ সে জানে যদি এ কথা মিথ্যা হয় তা হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এবং সে মৃত্যুদণ্ড অতি ভয়ঙ্কর নির্মমভাবে সংঘটিত হবে। ঢোক গিলে বললো গোংলাই—হাঁ মালিক!

যাও ডেকে আনো!

গোংলাই চলে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো গোংলাইসিং তার সঙ্গে বিশু এসে দাঁড়ালো হামবার্টের সম্মুখে। থর থর করে কাঁপতে থাকে বিশু।

হামবার্ট দাঁতে দাঁত পিষে বলে—যা বলেছো সত্য!

হ্যাঁ মালিক সত্য।

চিৎকার করে উঠে হামবার্ট—মিথ্যে কথা খান বাহাদুর আর নীলা নয় দস্যু বনহুরও নিঃশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

না মালিক তারা নিঃচিহ্ন হয়ে যায়নি ; আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি খান বাহাদুর আলী সাহেব এবং তার মেয়ে নীলা কান্দাই শহরে জীবিত আছেন।

না-না এ হতে পারে না। আমি তাদের ধ্বংস করার জন্যই জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছি। শুধু তাদের নিঃচিহ্ন করার জন্য....

গুহা মধ্যে দপ দপ করে মশাল জ্বলছে।

হামবার্টের চোখ দু'টো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে! দাঁতে দাঁত পিষছে সে।

বিশু বলে আবার—মালিক সব সত্য কথা।

এবার হামবার্ট কোন কথা বলে না সে ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করতে থাকে।

তার অনুচরগণ সবাই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! না জানি তাদের ভাগ্যে কি আছে। গত রাতে জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস হবার সময় বেশ কিছু সংখ্যক অনুচর নিহত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই! হামবার্ট যখন দস্যু বনহুরকে হত্যা করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো তখন তার কোন কথা স্মরণ করার মত মনের অবস্থা ছিলোনা। সে ক্ষিপ্র গতিতে বেরিয়ে এসেছিলো জঙ্গল বাড়ি ঘাটির বাইরে নির্দিষ্ট এক গোপন গুহায়। সেখানে থেকে জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করার জন্য ডিনামাইটের মেইন সুইচ-টিপে দিয়েছিলো। এক সঙ্গে পাঁচটি ডিনামাইট বাষ্ট হয়ে ছিলো। প্রচণ্ড শব্দ, তার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলবাড়ি ঘাটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিলো! কে মরলো আর কে জীবিত রইলো ভেবে দেখার সময় ছিলো না হামবার্টের। সেই মুহূর্তে হামবার্ট ভুলে গিয়েছিলো তার কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মহামূল্যবান ঘাটি ধ্বংসের কথা, দস্যু বনহুর হত্যার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলো সে।

হামবার্ট যখন শুনলো খান বাহাদুর আমির আলী আর তার কন্যা নীলা জীবিত আছে তখন তার সমস্ত শরীরে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো। মাথাটা যেন বন বন করে ঘুরে উঠেছিলো সেই মুহূর্তে। হামবার্টের সম্মুখে আচমকা বজ্রপাত হলেও সে এতোখানি চমকে উঠতো না। পাঁচ পাঁচটা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ থেকে তারা বাঁচতে পারে এটা কল্পনার বাইরে।

হামবার্ট চিৎকার করে উঠলো—এই মুহূর্তে বিশুকে হত্যা করো।

সঙ্গে সঙ্গে হামবার্টের একজন অনুচর বিশুর বুক লক্ষ্য করে রাইফেল তুলে ধরে গুলি করলো।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে গুহার মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো বিশুর রক্তাক্ত দেহ।

হামবার্ট অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

তারপর হাসি থামিয়ে বললো—মিথ্যা কথার উচিৎ সাজা আমির আলী আর নীলাই শুধু নয় বিখ্যাত দস্যু বনহুরও জীবিত নাই.....জীবিত থাকতে পারে না! একটি নয় দুটি নয় পাঁচটা ডিনামাইটের বিস্ফোরণ সহ্য করা তাঁদের সাধ্য নয়-------হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ....

হামবার্টের হাসির শব্দে কান্দাই পর্বতমালার গোপন গুহার দেয়ালগুলো যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। সে কি ভীষণ ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হাসি।

বললো হামবার্ট—মাদার্ন যাও এক্ষুণি তুমি কান্দাই শহরে চলে যাও। দেখে এসো বিশু যে সংবাদ এনেছিলো তা সত্য না মিথ্যা!

আচ্ছা মালিক আমি এক্ষুণি কান্দাই শহর অভিমুখে রওয়ানা দিচ্ছি।

হাঁ তাই যাও।

বেরিয়ে যায় মাদার্ণ।

লম্বা দোহারা লোকটা, মাথায় লালচে চুল। চোখ দু'টো ঘোলাটে। গায়ের রং সম্পূর্ণ তামাটে। মাদার্ন বাঙ্গালী বা পাঞ্জাবী নয় সে খাটি ইহুদী। ভাল বাংলা জানে। অবশ্য হামবার্টের কাছে যারা আছে তারা বাঙ্গালী না হলেও সবাই ভাল বাংলা বলতে পারে বা বাংলা ভাষা জানে।

মাদার্ন বেরিয়ে গেলো।

হামবার্ট বললো—গোংলাইসিং, শুধু মাদার্ন নয় তুমি অন্য পথে যাও। ছদ্মবেশে যাবে সত্যি যদি খান বাহাদুর আর তার কন্যা জীবিত থাকে তা হলে খান বাহাদুর ও তার কন্যা নীলাকে আবার আমার সম্মুখে নিয়ে এসো। তারপর.....তারপর দাঁতে দাঁত পিষে হামবার্ট চাটার্জী।

চাটার্জী উপাধি গ্রহণ করার জন্য তাকে বাঙ্গালী সাজতে হয়েছিলো। বাংলায় কথা শিখতে হয়েছিলো বেশ কিছুদিন ধরে। অবশ্য বাঙ্গালী জাতিকে হাত করার জন্যই তাকে এই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল।

গোংলাইসিংও বেরিয়ে গেলো বিনা বাক্যে।

হামবার্ট তার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে কান্দাই পর্বতমালার দক্ষিণে একটি গুহার আস্তানা নিয়েছিলো। সে পূর্ব হতেই এই গুহাটার সঙ্গে জঙ্গল বাড়ি ঘাটির যোগাযোপ রেখেছিলো। এ গুহাটা ছিলো বিরাট বড় এবং ভূগর্ভে। বাইরে থেকে এ গুহা কারো নজরে পড়বে না। পর্বতমালার তলদেশে দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে সেই পথে এ গুহায় প্রবেশ করা যায়।

হামবার্ট এই পথই বেছে নিয়েছিলো তার বিপদ মুহূর্তে নিরাপদে পলায়নের জন্য এবং এই গুহা মধ্যে এমন একটা মেশিন সে তৈরি করে রেখেছিলো যার সুইচ টিপলেই সমস্ত জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু ঐ গুহা বিনষ্ট হবেনা।

এই ভূগর্ভ গুহা মধ্যে হামবার্ট তার গুটি কয়েক সঙ্গী সাথী নিয়ে অবস্থান করছে। সে বুঝতে পেরেছিলো দস্যু বনহুর তার ঘাটির সন্ধান পেয়েছে তখন আর সেখানে তার কাজ চলবেনা তাই হামবার্ট ঘাটি বিনষ্ট করে দস্যু বনহুরকে হত্যা করতে চেয়েছিলো।

বিশুর লাশ তুলে নিয়ে গেলো দু'জন অনুচর।

হামবার্ট এবার তার লৌহ আসনে বসে পড়ে বললো—যদি খান বাহাদুর তার গবেষণাগারে প্রবেশ করে এবং তার কোন মেশিনে হাত দেয় সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগার ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে। আমি এখান থেকেই সেই সুইচ অন করে রেখেছি....কথা শেষ করেই হামবার্ট উঠে দাঁড়ায়, তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলে—যাও তোমরা তোমাদের কাজে যাও।

মালিকের নির্দেশ পাওয়া মাত্র বেরিয়ে যায় হামবার্টের সঙ্গীগণ। হামবার্ট গুহার মেঝেতে এক জায়গায় পা দিয়ে চাপ্ দেয় সঙ্গে সঙ্গে একটা গুপ্ত পথ বেরিয়ে আসে, হামবার্ট সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করে!

নীচে অদ্ভুত সুন্দর সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

কক্ষ হলেও সেটা গুহা বটে কিন্তু ঠিক একটি ঘরের মত দেখতে! মেঝেতে গোলকার একটা টেবিলে। টেবিলে কয়েকটা বিদেশী মদের বোতল। কাঁচপাত্রও রয়েছে বোতলের পাশে।

টেবিলের পাশে একটা লৌহ চেয়ার হামবার্ট সেই চেয়ারে বসে পড়ে তারপর গেলাসের পর গেলাস মদ পান করে চলে।

নেশায় ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠে হামবার্ট সে এবার পাশের খাটিয়ায় ধপ করে শুয়ে পড়ে। তারপর মুদে আসে ওর দুটো চোখ।

মাদার্ন তখন তার গাড়ি নিয়ে এলো পাথারী পথে ছুটে চলেছে। পাথুরিয়া উচু নীচু পথে চলতে তার গাড়িখানা এতোটুকু হিমসিম খাচ্ছেনা। শব্দহীন অদ্ভুত জীপ গাড়ি!

গোংলাইসিং ছদ্মবেশেই রওয়ানা দিলো কারণ আমির আলী সাহেব তাকে চেনেন এমন কি নীলাও তাকে দেখেছিলো সেদিন। কাজেই গোংলাই ছদ্মবেশে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয় মনে করলো।

মাদার্ন অবশ্য আমির আলী সাহেবকে চেনে কিন্তু আমির আলী সাহেব মাদার্নকে দেখেনি কোনদিন। নীলা ও মাদার্নকে দেখেনি কোন সময়। ত্যই মাদানার কোন ছদ্ম বেশের প্রয়োজন হলো না।

আমির আলী সাহেব তার হল ঘরে বসে নীলার সঙ্গে কথা-বার্তা বলেছিলেন। এমন সময় বাইরে একটি গাড়ি এসে থামলো।

রংলাল তার নিজের শয়ন কক্ষ থেকেই দেখতে পেলো গাড়িখানা। সে বেরিয়ে এলো গাড়ি বারেন্দায়।

ততক্ষণে মার্দান নেমে দাড়িয়েছে তার গাড়ি থেকে। রংলালকে লক্ষ্য করে ডাকলো মাদার্ন—এই বয় শোন।

রংলাল প্রথমে যেন শুনতেই পায়নি পরে বললো—আমাকে ডাকছেন সাহেব?

হাঁ শোন সাহেব নয় বলো ভদ্রলোক।

বলুন?

তুমি কি এই বাড়িতে কাজ করো?

আজ্ঞে হাঁ এই বাড়িতে কাজ করি।

কি কাজ করো?

ঘর দুয়ার পরিস্কার করি। খাবার টেবিলে খাবার পরিবেশন করি।

ও বেশ বেশ। তোমাদের মালিক বাসায় আছেন কি?

এবার রংলাল তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো মাদার্নের দিকে। পা থেকে মাথা অবধি ভালভাবে লক্ষ্য করে বললো—হাঁ আছেন।

আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো বিশেষ জরুরী কথা আছে।

কিন্তু সাহেব দেখা করবেন কিনা আমি ঠিক বলতে পারছিনা। আপনি অপেক্ষা করুন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আসছি।

রংলাল চলে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো—আসুন।

মাদার্ন রংলালকে অনুসরণ করলো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা উভয়েই ছিলো সেই কক্ষে।

মাদার্ন সাহেবী কায়দায় ছালাম জানালো মাথায় ক্যাপ খুলে।

আমির আলী সাহেব ছালামের জবাব দিয়ে বললেন বসুন।

মাদার্ন আসন গ্রহন করতেই নীলা বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

মাদার্ন সশ ব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আপনি যাচ্ছেন কেন? বসুন—বসুন....

রংলাল বললো—বসুন আপামনি।

নীলা বসলো আবার।

সবার সম্মুখে রংলাল নীলাকে আপামণি এবং আপনি বলেই সম্বোধন করতো।

মাদার্ন কি কথা বলে শুনবার জন্য রংলাল উম্মুখ হয়ে রইলো। সে মিছামিছি নেকড়া দিয়ে টেবিল চেয়ারগুলো মুছতে লাগলো।

মাদার্ন হাতের মধ্যে হাত কছলে বললো—আলী সাহেব আমি হিন্দল থেকে এসেছি। আমরা নতুন একটা রবার কোম্পানী খুলছি, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সেয়ারে কাজ করতে চান তা হলে আমরা খুশি হবো।

আমির আলী সাহেব বললেন—হাঁ আমার ও ঐ রকম একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুযোগ সুবিধার অভাবে হয়ে উঠেনি। তা আপনারা যদি আমাকে এ ব্যাপারে সুবিধা দেন তা হলে.....।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আপনি আমাদের কোম্পানীর কাছ থেকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাবেন। আপনার কন্যাও আমাদের কোম্পানী দেখে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করবে।

রংলাল কাজের ফাঁকে তীক্ষ্ণ নজরে একবার লোকটার মুখ দেখে নিলো। ওর বলার ভঙ্গী দেখে ভ্রুকুঞ্চিত হলো তার।

লোকটা বলেই চলেছে—আলী সাহেব কান্দাই শহরে আপনার যথেষ্ট নাম আছে তাই আমরা চাই আপনি আমাদের কোম্পানীতে যোগ দেবেন। যদি রাজি থাকেন, তবে কবে কখন আবার আমরা আসবো বলে দিন দয়া করে।

আমির আলী সাহেব বললেন—আজ আমি সঠিক কিছু বলতে পারছিনা। আপনি অন্য একদিন আসুন ঐদিন আমি সব বলবো।

আচ্ছা তাই আসবো ঐ দিন আপনি এবং আপনার কন্যাকে আমি নিয়ে যাবো আমাদের কোম্পানীতে, দেখে অনেক খুশি হবেন আপনারা। হাঁ এই নিন আমার নেম কার্ড.... মাদার্ন ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে দিলো আমির আলী সাহেবের হাতে।

আমির আলী সাহেব নেম কার্ডটায় দৃষ্টি বুলিয়ে রেখে দিলেন টেবিলে পেপার অয়েটের নিচে!

মাদার্ন উঠে দাঁড়ালো, পুনরায় মাথার ক্যাপ খুলে সাহেবী কায়দায় ছালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেলো। বেরিয়ে যাবার সময় সে একবার তীক্ষ্ণ নজরে নীলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিলো।

আমির আলী সাহেব মাদার্নকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিলেন।

মাদার্ন গাড়িতে বসে হাত নাড়লো।

গাড়িখানা বেরিয়ে যাবার পরও আমির আলী সাহেব সেখানে থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছেন।

রংলাল এসে কখন তার পিছনে দাঁড়িয়েছে তিনি দেখতে পাননি। ফিরে দাঁড়াতেই বললো রংলাল—মালিক লোকটা আসলে নকল।

ভ্রুকুঁচকে তাকালেন আমির আলী সাহেব রংলাল এর মুখের দিকে বললেন....আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

রংলাল বললো—লোকটা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলো মালিক।

নেমকার্ডে যে কোম্পানীর নাম লেখা আছে সে নাম কিন্তু কোনদিন কোন খানে শুনিনি। লোকটার নামও অদ্ভুত ধরনের মিঃ হিংহালা। আমির আলী সাহেব কথাগুলো বলতে বলতে হল ঘরের দিকে এগুলেন।

রংলাল নেমকার্ডখানা নিজেই পড়ে নিয়েছিলো যখন আমির আলী সাহেব বেরিয়ে এসেছিলেন লোকটার সঙ্গে। তাই সে অবাক হলো না এখন নতুন করে।

রংলাল যখন নেমকার্ড খানা পড়ছিলো তখন নীলা তার পিছন থেকে উঁকিদিয়ে বলেছিলো পড়তে পারলে।

উহুঁ! ঠোট উল্‌টে জবাব দিয়েছিলো রংলাল।

ওগো অজানা বন্ধু আর কতদিন আমার সঙ্গে তুমি অভিনয় করবে। বলেছিলো নীলা।

নীলার কথায় রংলালের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়ছিলো।

নীলা হেসে বলেছিলো—দুষ্ট তুমি।

বনহুর হেসেছিলো কোন জবাব দেয়নি।

আমির আলী সাহেব হলঘরে প্রবেশ করতেই রংলাল বাগানের দিকে এগুলো। বাগানে নানা রকম ফুলের সমারোহ। রংলাল কতকগুলো ফুল তুলে নিয়ে বাগান থেকে যেমন বেরুতে যাবে অমনি একটি সাপুড়ে সাপের ঝুড়ি কাঁধে ফটকের পাশে এসে ডেকে বললো—সাপ খেলা দেখবেন বাবু—সাপ খেলা....

রংলাল কিছু বলবার আগেই নীলা রিলিং এর পাশে থেকে হাত নেড়ে বললো—ভিতরে এসো।

দারওয়ান গেট খুলে দিলো।

সাপুড়ে ফটকের ভিতরে প্রবেশ করলো।

নীলার পাশে এসে দাঁড়ালো রংলাল।

নীলা সাপুড়েকে লক্ষ্য করে বললে—খেলা দেখাও। তারপর রংলালের মুখে তাকিয়ে একটু হাসলো সে।

সাপুড়ে সাপের ঝুড়ি বের করলো কিন্তু ঝুড়ি না খুলেই বললো—সাপ খেলা দেখলে আমি যা বখশীস চাইবো তাই দিতে হবে।

রংলাল বললো—কি চাও তুমি?

ঐ যুবতীর আংগুলে অংগুরী আছে ওটা আমাকে দিতে হবে।

নীলা নিজের হাতের অংগুরীর দিকে তাকালো।

রংলাল বললো—ওর আংগুলের অংগুরী দিতে হবে—বলো কি সাপুড়ে!

হাঁ সাহেব, না হলে আমি সাপ খেলা দেখাই না।

নীলা বলল—বেশ আমি তাই দেবো।

রংলাল বলে উঠলো—নীলা।

তুমি আমাকে বারণ করো না মনির, আমি সাপ খেলা দেখবোই।

বেশ! গম্ভীর মুখে বললো রংলাল।

সাপুড়ে সাপ খেলা দেখানো শুরু করলো। বিরাট অজগর; নড়তে পারে না সাপটা, তবু সাপুড়ে ঐ সাপ নিয়ে নানাভাবে গলায় জড়িয়ে কাঁধে তুলে খেলা করতে লাগলো।

নীলার দু'চোখ বিস্ময়।

এমন বিরাট সাপ সে কোনদিন দেখেনি।

সাপ খেলা দেখে শুধু অবাকই হলো না নীলা, বিস্ময় বিমূঢ় হলো, নিজের আংগুল থেকে অংগুরীটা খুলে দিয়ে দিলো সে সাপুড়ের হাতে।

রংলাল ওকে কিছু বললো না।

সাপুড়ে চলে গেলো।

রংলাল আর নীলা ফিরে এলো তাদের নিজ নিজ কক্ষে।

রংলাল কক্ষ মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো, একটা গভীর চিন্তা তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিছু পূর্বে সেই অদ্ভুত বেশধারী রবার কোম্পানীর লোকটা এবং এই সাপুড়ে তার মনকে ভাবিয়ে তুলেছে। নিশ্চয়ই এরা স্বাভাবিক বা সাধারণ নয়। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এরা এসেছিলো। আমির আলী সাহেব এবং নীলাকে এখানে রাখা মোটেই উচিৎ হবে না।

রংলাল অনুমান করে নিলো এরা হামবার্টের লোক এবং আমির আলী সাহেব ও নীলার সন্ধানেই তাঁরা কান্দাই এসেছিলো।

হঠাৎ আমির আলী সাহেব এবং নীলাকে এ সব কথা সে বলতে পারে না, তারা তাকেই সন্দেহ করে বলতে, পারে। কিন্তু এদের যেমন করে হোক সরাতেই হবে।

নীলা নিজ হাতের আংগুল থেকে অংগুরী খুলে দেবে এটা রংলাল ভাবতে পারেনি। নীলা যে মস্ত ভুল করলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন কি করবে রংলাল ভাবতে লাগলো। তবে আজ রাতেই এদের এ বাড়ি থেকে সরানো দরকার।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেলো আমির আলী সাহেবের চোখ মেলতেই সম্মুখে দেখলো সেই লোক, জমকালো পোশাক পরা....স্বয়ং দস্যু বনহুর।

আমীর আলী সাহেব আমতা আমতা করে বললেন---আপনি....আপনি....

আপনি নয় তুমি।

তুমি আসবে বলেছিলে.....

হাঁ... তাইতো এসেছি। শুনুন খান বাহাদুর সাহেব সুচতুর হামবার্ট আপনাদের পিছু ছাড়েনি এখনও, কাজেই এখানে থাকা আপনাদের মোটেই নিরাপদ নয়। তাই আমি এসেছি আজ রাত ভোর হবার পূর্বেই আপনি এবং নীলা এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

ঢোক গিলে বলেন আমীর আলী সাহেব—তুমিই বলে দাও, আমরা কোথায় যাবো? কোথায় গেলে হামবার্টের কবল থেকে রক্ষা পাবো?

একটি গাড়ি আপনার বাড়ির পূর্বদিকের রাস্তায় অপেক্ষা করবে, আপনারা মানে আপনি এবং নীলা ঐ গাড়িতে বসবেন। গাড়ির ড্রাইভার আপনাদের ঠিক জায়গায় পৌছে দেবে।

কিন্তু.....

কোন কিন্তু নয় আপনি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না। দস্যু বনহুর যেমন আচমকা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেছিলো তেমনি হঠাৎ বেরিয়ে গেলো।

আমির আলী স্থবীরের মত বসে রইলেন, দস্যু বনহুরের কাছে আরও অনেক প্রশ্ন করার ছিলো কিন্তু তা আর হলো না। তিনি কি করবেন যেন ভেবে পাচ্ছেন না।

দস্যু বনহুরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল...কোন কিন্তু নয় আপনি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না.... আপনার বাড়ির পূর্বদিকের রাস্তায় একটি গাড়ি অপেক্ষা করছে আপনি আর নীলা ঐ গাড়িতে গিয়ে বসবেন...ড্রাইভার আপনাদের ঠিক জায়গায় পৌছে দেবে...

আমীর আলী সাহেব আর এক দণ্ড দেরী করলেন না, তিনি তার বিশাল ঐশ্বর্যের মায়া বিসর্জন দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কারণ, জীবনের কাছে ঐশ্বর্য কিছু নয়। দস্যু বনহুর তাঁকে নিশ্চয়ই মন্দ পরামর্শ দেয় নি। সে যে একজন হিতাকাঙ্খী তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমির আলী সাহেব তাড়াতাড়ি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নীলার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলো—মা নীলা। নীলা!

পিতার চাপা এবং উদ্বিগ্ন ভরা কণ্ঠস্বরে নীলার নিদ্রা ছুটে যায়, বিছানায় উঠে বসে বলে—আব্বু!

ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন আমির আলী সাহেব—নীলা শীঘ্র উঠে পড়ো এক্ষুণি এ বাড়ি ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে।

আব্বু এ তুমি কি বলছো?

হাঁ মা আর এক মুহূর্ত দেরী করা উচিৎ হবে না।

আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না আব্বু?

মা একটু পূর্বে স্বয়ং দস্যু বনহুর আমার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো।

দস্যু বনহুর আবার এসেছিলো বলো কি আব্বু?

হাঁ সেই তো বলে গেলো আপনি এবং নীলা এদণ্ডে এই বাড়ি ত্যাগ করুন যদি হামবার্টের কবল থেকে রক্ষা পেতে চান মা আর দেরী করোনা, উঠে পড়ো।

কিন্তু এতো রাতে আমরা কোথায় যাবো আব্বু?

সে চিন্তা আমাদের করতে হবে না নীলা দস্যু বনহুর আমাদের রক্ষার দায়িত্বভার নিয়েছে।

দস্যু বনহুর আমাদের রক্ষার দায়িত্ব ভার নিয়েছে এ-কি কথা বলেছো আব্বু? সে যে কি মতলবে আমাদের পিছু নিয়েছে সেই জানে। আমি কিন্তু তাকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে পারছিনা।

নীলা তুমি ভুল করছো, যে আমাকে এবং তোমাকে নর-শয়তান হামবার্টের মত পিশাচের কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না!

না আব্বু! কারণ সে কি জন্য আমাদের প্রতি এমন সহানুভূতিশীল হলো ঠিক বুঝতে পারছি না।

এতো ভাববার সময় কই মা শীঘ্র উঠে পড়! দেখা যাক কি হয় .... একটু থেমে বললেন আমির আলী সাহেব—আমরা এমন একটা বিপদের

সম্মুখীন হয়েছি যার কোন তুলনা হয় না নীলা। হামবার্ট একদিন আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলো আর আজ সেই আমার যম- আমার মৃত্যুদূত। নীলা দস্যু বনহুরের হাতে জীবন দেওয়া তবু শ্রেয় হামবার্টের হাতে নয়। মা উঠে পড় আর এক মুহূর্ত দেরী করিস না।

বেশ বলো কিন্তু রংলালকে সঙ্গে নিতে হবে।

তা হয় না মা। এটা আমরা সখের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি না।

আব্বু রংলাল সঙ্গে থাকলে অনেক অনেক ভাল হবে। সে অসীম সাহসী....

তবু হয় না নীলা। দস্যু বনহুর এ ধরনের কিছু বলেনি।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে গেঁথে গেলো খাটের সঙ্গে।

চমকে উঠলেন আমীর আলী সাহেব এবং নীলা। ছোরার বাটে একখানা চিঠি গাঁথা আছে দেখতে পেলো তারা। আমির আলী সাহেব ছোরাখানা হাতে তুলে নিয়ে চিঠিখানা খুলে মেলে ধরলেন চোখের সামনে—

—আলী সাহেব আপনি এবং নীলা
এই মুহূর্তে বাড়ি ত্যাগ করুন।

—দস্যু বনহুর

আমির আলী সাহেব চিঠিখানা নীলার হাতে দিয়ে বলেন—দেখ মা দেখ্ পড়ে দেখ কাগজের টুকরাখানা।

নীলার দু'চোখে ভয় বিস্ময় ঝরে পড়ছে। সে চিঠির দু'ছত্র লেখার উপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—চলো আব্বু। গলাটা যেন চাপা কান্নায় ভরে উঠেছে ওর।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা রাতের অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নীচে। আমির আলী সাহেবের মুখ ফ্যাকাশে মলিন-বিমর্ষ, নিজের বাড়ি থেকে তাকে চোরের মত পালাতে হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে তিনি নিজেই জানেন না।

বিশাল ঐশ্বর্যের অধিপতি আমির আলী সাহেব আজ রিক্ত নিঃস্ব অসহায় অবস্থায় শুন্য হাতে পালিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। আশ্চর্য ফটকে দারওয়ান পর্যন্ত নেই, এরা সব গেলো কোথায় তবু তার মুখ দিয়ে আজ কোন কথা বের হলো না। সোজা ফটক পেরিয়ে পিতা পুত্রি এগুলো বাড়ির পূর্বদিকের রাস্তা ধরে।

কিছুটা এগুতেই তাদের নজরে পড়লো একটি গাড়ি রাস্তার উপরে অপেক্ষা করছে।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা বাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

গাড়িতে চেপে বসলো তারা।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

জনশূন্য প্রশস্ত রাজপথ বেয়ে উল্‌কা বেগে গাড়ি ছুটে চললো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা গাড়ির পিছন আসনে বসে থাকে পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে। পিতা পুত্রি কারো মুখে কোন কথা নেই। তারা যেন কোন অজানার পথে এগিয়ে চলেছে।

বহুক্ষণ ধরে গাড়ি চললো।

এ পথ সে পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকার হলেও লাইট পোষ্টের আলোতে পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নীলা এপথ চিনতে পারলো না।

আমির আলী সাহেব কেমন যেন তন্দ্রাচন্নের মত হয়ে পড়েছেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

কতক্ষণ কেটে গেলো।

গাড়িখানা এক সময় এসে থামলো একটি ছোট গলির মুখে।

গলিটা বহু পুরোন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

গলির মধ্যে জমাট অন্ধকার?

শিউরে উঠলো নীলা।

আমির আলী সাহেবের কণ্ঠনালী বেশ শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে। তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন একেবারে!

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

আমির আলী সাহেব নেমে দাঁড়ালেন।

নীলা গাড়ি থেকে নামতে নারাজ বলে মনে হলো।

আমির আলী সাহেব কম্পিত গলায় বললো—নেমে আয় নীলা।

নীলা এবার না নেমে পারলো না।

আমির আলী সাহেব আর নীলা যখন গাড়ি থেকে অন্ধকারে গলির মুখে নেমে দাঁড়ালো তখন ড্রাইভার নীরবে অগ্রসর হলো। আমির আলী সাহেব আর নীলা তাকে অনুসরণ করলো।

গলির মধ্যে একে অন্ধকার তারপর আবর্জনাভর্তি দুর্গন্ধময়। নীলার নাড়ি ভুড়ি যেন বেরিয়ে আসতে চায় তবু সে এ বিপদ মুহূর্তে নাকে রুমাল চাপা দেবার কথা ভুলে যায়।

নীলা আমির আলী সাহেবকে ধরে এগুতে থাকে।

ড্রাইভার সম্মুখে এগুচ্ছে।

অন্ধকারে তাদের চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। এ গলির মধ্যে কোন লাইট পোষ্ট না থাকায় অন্ধকার জমাট হলেও পথ দেখা যাচ্ছিলো এবং ড্রাইভারকেও নজরে পড়ছিলো।

বেশ কিছুদূর এগুনোর পর একটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ড্রাইভার।

আমির আলী সাহেব এবং নীলাও থেমে পড়লো। মুখমণ্ডল তাদের দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

ড্রাইভার দরজার পাশে একটি বোতামে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো। ভিতরেও বাইরের মত অন্ধকার।

ড্রাইভার দরজার ভিতর প্রবেশ করলো। আমির আলী সাহেব এবং নীলা তাকে অনুসরণ করে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

নীলা চমকে উঠলো ভীষণভাবে।

আমির আলী সাহেবের অবস্থাও তাই। তিনি যন্ত্রচালিত পুতুলের মত এগিয়ে চললেন।

কিছুটা এগুনোর পর একটি সুড়ঙ্গ পথ পেলেন তারা। সেই পথে ড্রাইভার এগুতে লাগলো।

আমির আলী সাহেব এবং নীলাও তাকে অনুসরণ করে চললো।

বেশ কিছুটা চলার পর একটি লিফ্‌ট সম্মুখে দেখতে পেলো আমির আলী সাহেব আর নীলা।

ড্রাইভার লিফটে উঠে দাঁড়াল।

আমির আলী সাহেব আর নীলাও লিফটে চেপে পড়লো। অবশ্য এ ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিলো না তখন। যা তাদের ভাগ্যে আছে তাই ঘটবে, তবু হামবার্টের নিকট আত্মসর্মপণ করবে না। তবে আশ্চর্যও তারা কম হয়নি কারণ অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন একটি গলিতে তেমনি অপরিচ্ছন্ন একটি বাড়ির মধ্যে এমন ধরনের পথ আছে বা লিফ্‌ট রয়েছে এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমির আলি সাহেব এবং নীলার বিস্ময় না কমতেই একটি উজ্জল আলো তাদের চোখ বাঁধিয়ে দেয়। লিফ্‌ট খানা থেমে পড়েছে। সুন্দর একটি কক্ষ।

লিফ্‌ট থেকে ড্রাইভার নেমে পড়লো।

আমির আলী সাহেব আর নীলাও নেমে দাঁড়ালো। সম্মুখে তাকিয়েই চমকে উঠলো আবার তারা।

একটি আসনে উপবিষ্ট স্বয়ং দস্যু বনহুর।

নীলার বুকটা কেঁপে উঠলো তার অজান্তে।

আমির আলী সাহেব ভীত না হলেও তিনি যে বেশ হকচকিয়ে গেছেন তা তার মুখমণ্ডল দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে। নীলা পিতার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

ড্রাইভার দস্যু বনহুরকে কুর্নিশ জানিয়ে চলে গেলো।

এই এতোটা পথ ড্রাইভারের সঙ্গে তারা এসেছে এর মধ্যে ড্রাইভার তাদের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

নীলার মনে ব্যাপারটা বেশ দাগ কেটে যাচ্ছিলো কিন্তু কিছু বলতে সাহসী হয়নি সে।

ড্রাইভার চলে গেলো!

আমির আলী সাহেব আর নীলা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পাশাপাশি দুটি মূর্তির মত।

দস্যু বনহুর এবার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। তার দেহে এখন সেই জমকালো পোশাক! মাথার পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। পায়ে ভারী বুট, কোমরের বেলটে রিভলভার এবং ছোরা। এগিয়ে এলো বনহুর কয়েক পা তারপর বললো—বড্ড ঘাবড়ে গেছেন আপনারা। কিন্তু ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

নীলার দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, কয়েক ঘন্টা পূর্বে নীলার কক্ষে যখন তার আব্বুর সঙ্গে কথা হচ্ছিলো তখন একটি ছোরা এসে এসে খাটের গায়ে বিদ্ধ হয়! ছোরাখানায় একটি চিঠি গাঁথা ছিলো, চিঠিখানা লিখে ছিলো দস্যু বনহুর। আর সেই দস্যু বনহুর এখানে তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

নীলা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছিলো দস্যু বনহুরকে।

আমির আলী সাহেব বললেন এবার—না না ঘাবড়ে যাইনি। ঘাবড়ে যাইনি! তুমি যখন আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছো তখন

আর ঘাবড়াবার কি আছে। সত্যি বলতে কি এখন আমি নিজকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত মনে করছি.....

হাঁ আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। যান ঐ যে দরজা দেখছেন ওদিক দিয়ে ভিতরে চলে যান।

আমির আলী সাহেব ওদিকের দরজার দিকে পা বাড়ান।

নীলাও তাকে অনুসরণ করে।

বনহুর বলে— আপনি এদিকের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে যান মিস নীলা।

দস্যু বনহুরের মুখে নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নীলা, তাকালো সে ওর চোখ দুটোর দিকে।

বনহুর হেসে বললো—এদিকে যান।

নীলা এবার বাধ্য হলো বনহুরের কথা মত এগুতে। আমির আলী দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দু'জন লোক এগিয়ে এলো তারা তাকে বললো—আসুন আমাদের সঙ্গে।

আমির আলী সাহেব বাধ্য হলেন লোক দু'জনকে অনুসরণ করতে!

কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা সুসজ্জিত ঘরে এসে দাঁড়ালো লোক দু'জন। তাদের মধ্যে একজন বললো—এ কক্ষ আপনার জন্য। আপনি যা প্রয়োজন সব এখানে পাবেন।

বেরিয়ে গেলো লোক দু'জন।

আমির আলী সাহেব কক্ষ মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। কক্ষের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই রয়েছে। এমন কি যে চুরুট তিনি পান করেন সেই চুরুটও টেবিলে সাজানো আছে। আলী সাহেব বিস্মিত হলেন দস্যু বনহুর কি করে জানালো তিনি কোন জাতীয় ধূমপান করেন।

ঠিক নীলার অবস্থাও তাই।

নীলা ভয় কম্পিত পদক্ষেপে অপর দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দুজন লোক তাকে স্বসম্মানে অভ্যর্থনা জানালো। একজন বললো—আসুন আমাদের সঙ্গে।

নীলা কোন জবাব না দিয়ে লোক দু'জনকে অনুসরণ করলো। যদিও লোক দুজনকে দেখে তার হৃদপিণ্ড ধক্ ধক্ করছিলো। এরা যে স্বাভাবিক সাধারণ লোক নয় তা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। বলিষ্ঠ জোয়ান

দেহ, শরীরে জমকালো পোশাক, গোঁফ জোড়া এবং চোখ দুটো দেখলেই মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

নীলা বুঝতে পারে এরা দস্যু বনহুরের অনুচর!

কিন্তু এদের ব্যবহারে নীলা কোন ত্রুটি খুঁজে পায়না। নীলাকে এরা সঙ্গে করে নিয়ে আসে একটি সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে। কক্ষটা আধুনিক রুচী সম্মত ভাবে সাজানো।

নীলা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে থ' মেরে গেলো যেন। সুন্দর পরিষ্কার বিছানার উপর নরম দুটি বালিশ। ধপ ধপে মশারী খাটানো রয়েছে এমন কি আলনায় বেশ কয়েক খানা শাড়িও ভাঁজ করা রয়েছে।

ও পাশে ড্রেসিং টেবিলে সুন্দর করে সাজানো প্রসাধনী সামগ্রী। কোনটাই বাদ যায়নি যেন।

নীলা যখন বিস্ময় নিয়ে এসব দেখছে। তখন পিছনে সেই কণ্ঠস্বর—মিস নীলা এ কক্ষ আপনার জন্য।

চমকে ফিরে তাকালো নীলা।

দস্যু বনহুর কখন তার পিছনে এসে দাড়িয়েছে।

নীলা লোক দুটির সন্ধানে এ পাশ ও প্যাশে তাকায়। এ মুহূর্তে ঐ লোক দুজনকেই তার ব্যাকুল আঁখি যেন খুঁজে ফেরে। সম্পূর্ণ নির্জন কক্ষে দস্যু বনহুরকে যেন সে সহ্য করতে পারছিলো না।

বনহুর নীলার ভীত আতঙ্কিত মুখভাব লক্ষ্য করে বলে—ওরা চলে গেছে। কি প্রয়োজন বলুন মিস নীলা আমি আপনার আদেশ পালন করতে বাধ্য আছি!

নীলার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠে, ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলো—না না আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। তুমি যাও চলে যাও দস্যু বনহুর।

একটু হেসে বলে বনহুর—চলে যাবো কোথায়? এ সবই যে আমার মিস নীলা, কাজেই....

না না আমি কান কথা তোমার শুনতে চাই না। তুমি যাও। চলে যাও এখান থেকে...

বেশ যাচ্ছি কিন্তু আবার আসবো। এখন আপনি বিশ্রাম করুন মিস নীলা।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

নীলা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে বিছানার পাশে। সমস্ত মুখখানা তার বিষণ্ন মলিন হয়ে পড়েছে। সে বিছানায় বসে পড়ে তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

❑

বোমার মত ফেটে পড়ে হামবার্ট—মাদার্ন তুমি নিজে দেখে এসেছো আমির আলী আর নীলা জীবিত আছে এবং তাদের বাস ভবনে রয়েছে।

হাঁ মালিক আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি তারা জীবিত আছে এবং কান্দাই আমির আলী সাহেবের নিজ বাসভবনে অবস্থান করছে। কথাগুলো বলে থামলো মাদার্ন।

তুমি কি ভাবে সেখানে গিয়েছিলে মাদার্ন তার বর্ণনা দাও?

আমি রবার কোম্পানীর এজেন্ট এর বেশে সেখানে যাই এবং স্বয়ং আমির আলী সাহেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। আমি তাঁকে আর কন্যা নীলাকে আমাদের কোম্পানী দেখে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এসেছি।

চমৎকার বুদ্ধি এঁটেছিলে মাদার্ন। কোম্পানী দেখতে এলেই আমার হাতের মুঠায় এসে যাবে তারা। তারপর যাবে কোথায়.... কিন্তু আমি ভাবছি আর একটি কথা দস্যু বনহুর গেলো কোথায়। আমির আলী এবং নীলার পিছনে রয়েছে এই ভয়ঙ্কর দস্যুটা না হলে এরা বাঁচতে পারতো না কিছুতেই। এই দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই দেখছি....

মাদার্ন বলে উঠে—মালিক আপনি কি তাহলে মনে করেন দস্যু বনহুর জঙ্গল বাড়ি ঘাটির ধ্বংস স্তূপ থেকে বেঁচে গেছে?

হাঁ। সে যদি না বাঁচতো তাহলে আমির আলী আর নীলা বাঁচতো না। দস্যু বনহুরই কোনক্রমে এদের বাঁচিয়ে নিয়েছে।

মালিক একেবারে যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ঐ ভয়ঙ্কর দস্যুর অসাধ্য কিছু নেই একথা তোমাদের আমি পূর্বেই বলেছি। সব আমার ব্যর্থ হয়েছে মাদার্ন সব আমার ব্যর্থ হয়েছে....একটু থেমে আবার বলে হামবার্ট—জীবনের সব প্রচেষ্টা আমি ধ্বংস করে ফেলেছি শুধু ঐ দস্যু বনহুরকে ধ্বংস করার জন্য। হামবার্ট নিজের মাথার চুলগুলোও টেনে ছিঁড়তে থাকে।

মাদার্ন বলে বলে উঠে—মালিক আমির আলী আর নীলার প্রতি তার এ অনুরাগ হলো কি করে ভেবে পাচ্ছি না! এদের রক্ষা করে তার লাভ কি?

মাদার্ন তুমি জানো না ঐ দস্যু বনহুর কত চরিত্রহীন। নীলার মত সুন্দরী নারী, কার না লোভ হয়। দস্যু বনহুর নীলার প্রতি আসক্ত হয়েছে এবং সেই কারণেই পিতা পুত্রীকে রক্ষার জন্য সে উঠে পড়ে লেগে গেছে। কিন্তু অপদার্থটা জানে না নীলাকে সে কোন দিন পাবে না কারণ নীলা আমার।

মালিক তাছাড়া নীলা তো ভালবাসে ঐ রংলালটাকে। সেদিনও আমি দেখেছি রংলালকে তার পাশে।

তাচ্ছিল্য ভরে হেসে বলে হামবার্ট—ও চুনে পুটির জন্য আমি মোটেই ভাবি না। ওকে যে কোন মুহূর্তে আমি টিপে মেরে ফেলতে পারবো। যত সমস্যা হলো ঐ দস্যু বনহুর... কিছুক্ষণ ঘন ঘন পায়চারী করে সে তারপর বলে—মাদার্ন তোমার কথা সব সত্য তো?

হাঁ মালিক।

গোংলাইসিং এলোনা এখন পর্যন্ত....

কথা শেষ হয় না হামবার্টের গোংলাইসিং এসে দাঁড়ায় লম্বা সেলুট ঠুকে।

হামবার্ট বলে—কে তুমি?

গোংলাই সাপুড়ে বেসেই এসেছিলো তাই হামবার্ট বা মাদার্ন তাকে চিনতে না পেরে চমকে উঠেছিলো। এবার গোংলাই তার নকল গোফ এবং গালে বড় আঁচলটা খুলে ফেলে তার সঙ্গে খুলে ফেলে মাথার পাগড়িটা।

হামবার্ট বলে—তোমার প্রবেশ কেনো গোংলাইসিং?

মালিক এবেশ নিয়েই আমি গিয়েছিলাম কান্দাই শহরে খান বাহাদুর আমির আলি স্যাহেবের বাস ভবনে!

চমৎকার! সাপুড়ের বেশে গিয়েছিলে।

হাঁ! হাঁ মালিক।

কি খবর বলো।

আমির আলী এবং তার মেয়ে জীবিত আছে দেখে এলাম।

প্রমাণ কিছু এনেছো?

হাঁ আমি প্রমাণ এনেছি মালিক। এই দেখুন.....পকেট থেকে নীলার আংগুলের আংটিটা বের করে হামবার্টের দিকে বাড়িয়ে ধরে গোংলাইসিং।

হামবার্ট এর মুখ খানা নর শয়তানের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, খুশি হয়ে হাত বাড়িয়ে গোংলাই এর হাত থেকে আংটিটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে

ধরে বলে—নীলা তোমার সাপ খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে এ অংগুরী পুরস্কার দিয়েছে বুঝি?

হাঁ মালিক।

তা হলে ওরা পিতা পুত্রী উভয়েই মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।

শুধু ওরা নয় ওদের সঙ্গে রয়েছে সেই জংলী যুবকটা, যার প্রেমে আত্মহারা নীলা রাণী।

ঠিক বলেছো গোংলাই নীলা ঐ জংলীটার প্রেমে আত্মহারাই বটে। কিন্তু ওকে আমি গ্রাহ্য করিনা যে কোন মুহূর্তে রংলাল ছোকরাটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবো। এখন কাজের কথা বলো মাদার্ণ আর গোংলাইসিং? কাজের কথা বলো?

মালিক বলুন!

কাজ হলো—এক নম্বর খান বাহাদুর আর নীলাকে কান্দাই শহর থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা। দুই নম্বর হলো—খান বাহাদুর আমির আলীর গবেষণাগার ধ্বংস করা। তিন নম্বর হলো—জংলী যুবক ঐ নেংটি ইঁদুর রংলালটাকে খতম করা তারপর চার নম্বর হলো দস্যু বনহুরের সঙ্গে মোকা বেলা করা।

মাদার্ন আর গোংলাইসিং প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলো—দস্যু-বনহুরের সঙ্গে মোকাবেলা মালিক আপনি করবেন, বাকি তিন নম্বর পর্যন্ত সব কাজ করবো আমরা।

গর্দভ তাছাড়া আর কি পারবে তোমরা। হাঁ এবার শোন মাদার্ন তুমি আমির আলী সাহেব আর নীলাকে কোম্পানী দেখার নাম করে কান্দাই পর্বত মালার পাদমূলে নিয়ে আসবে তারপর আমার কাছে।

আচ্ছা মালিক আপনার আদেশ মতই কাজ করবো। বললো মাদার্ন।

এবার হামবার্ট গোংলাইসিংকে লক্ষ করে বললো—গোংলাই তুমি রংলালকে হত্যা করে তার মাথাটা নিয়ে আসবে। আমি তার মাথা চাই। আর আমির আলীর গবেষণাগার ধ্বংস করবো আমি সে চাবিকাঠি আমার হাতে আছে।

গোংলাইসিং বললো—রংলাল এর মাথাটা আজই নিয়ে আসতে পারতাম মালিক কিন্তু এই সামান্য কাজের জন্য আমি বিলম্ব করিনি। যে কোন সময় আমি রংলালের মাথা নিয়ে হাজির হবো।

যে কোন দিন হলে চলবে না? রংলালের মাথা আমি দু'দিনের মধ্যেই চাই।

আচ্ছা মালিক।

এবার তোমরা যাও।

মাদার্ন আর গোংলাই চলে গেলো।

হামবার্ট পাশের একটি বেলে আংগুল রাখলো সংগে সংগে একজন নীল পোশাকধারী লোক এসে দাঁড়ালো—আদাব মালিক।

হামবার্ট বললো—এক নম্বর হিপিংকার বের করো।

আচ্ছা মালিক। কথাটা বলে চলে গেলো লোকটা।

হামবার্ট তার শয্যার পাশে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। টেবিলে একটি বোতামে চাপ দিতেই টেবিলটার মধ্যে একটি ছিদ্র পথ বেরিয়ে পড়লো। হামবার্ট ঐ ছিদ্র পথে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো নিচে। সুন্দর একটি সুড়ঙ্গ পথ কিছুদূর এগুতেই একটি কক্ষ। সেই কক্ষ মধ্যে প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

হামবার্ট কক্ষের মেঝেতে এসে দাঁড়াতেই দুজন এ প্রাণ পরা লোক এসে দাঁড়ালো হামবার্টের দু'পাশে।

হামবার্ট কিছু ইংগিৎ করে কক্ষের এক পাশে একটি টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ালো।

একজন লোক একটি এপ্রোন এনে বেঁধেদিলো হামবার্টের শরীরে।

টেবিলটার আশে পাশে নানারকম অস্ত্রসস্ত্র সাজানো ছিলো। আকারে টেবিলটা ঠিক অপারেশন টেবিলের মত। টেবিলের উপরে পাওয়ার ফুল বাল্ব ঝুলছে।

কক্ষের চার পাশের দেয়ালে নানারকম যন্ত্র াতি আর মেশিন রয়েছে। কক্ষটাকে প্রথম দর্শনে অপারেশান থিয়েটার বলেই মনে হবে।

আসলেও তাই, এটা শয়তান হামবার্টের অপারেশান কক্ষ। এখানে সে নিরীহ মানুষ ধরে এনে হৃদপিণ্ড তুলে নিয়ে অপর একজনের হৃদপিণ্ড সংযোগ পরীক্ষা চালায়। চক্ষু এবং রক্ত শোষণাগার ছিলো জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে। আর এই তার নতুন প্রচেষ্টা হার্ট শোধনাগার।

হামবার্ট হার্ট অপারেশন এবং হার্ট সংযোগ এ দক্ষতা লাভ করতে চায়। যেমন সে চক্ষু এবং রক্ত শোষণে দক্ষতা লাভ করেছে। এ ব্যাপারে সে কত

খানি সফলতা লাভ করবে সেদিকে তার কোন খেয়াল নেই, তবে সে অবিরত নর-হত্যা করে চলেছে।

হামবার্ট এর মুখে মাক্স এবং হাতে গ্লাক্স করে নিলো।

ততক্ষণ প্রথম দু'জন লোক হাতে পিছ মোড়া করে বাঁধা এবং চোখ বাঁধা একটি লোককে নিয়ে আসে টেবিলটার পাশে।

লোকটার চোখ বাঁধা থাকায় সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবু সে বুঝতে পারছে তার জন্য কোন ভয়ঙ্কর বিপদ এগিয়ে আসছে ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখখানা লোকটার জামা শূন্য, শুধু পরনে একটি পাজামা।

হামবার্টের অনুচর দু'জন লোকটাকে ধরে টেবিলে শুইয়ে দিলো। একজন একটা সিরিঞ্জ এনে ধরলো হামবার্টের সম্মুখে।

হামবার্ট ঐ সিরিঞ্জটা তুলে নিয়ে টেবিলে শায়িত লোকটার হাতে পুশ করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা অসহ্য যন্ত্রণামূলক আর্তনাদ করে উঠলো তারপর স্থির হয়ে গেলো ওর দেহটা!

হামবার্ট মুহূর্ত বিলম্ব না করে পাশের টেবিল থেকে একটি ছুরি তুলে নিয়ে সংজ্ঞাহীন লোকটার বুক চিড়ে ফেললো তারপর বুকের ভিতর থেকে বের করে আনলো ওর হৃদপিণ্ডটা।

পাশে দাঁড়ানো লোক দুটোর হাতে ছিলো কাঁচপত্র। হামবার্ট হৃদপিণ্ডটা বের করে ঐ কাঁচ পাত্রে রেখে বললো— একে সরিয়ে ফেলো।

লোক দু'টো হামবার্টর আদেশ অনুযায়ী লোকটার রক্তাক্ত দেহটাকে সরিয়ে ফেললো। তারপর তারা অপর আর একজন লোককে পূর্বের মত হাত পিছমোড়া করে বেঁধে টেবিলের পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো। এ লোকটিরও চোখ কালো কাঁপড়ে বাঁধা।

মৃতের মত পাংশু বিবর্ণ এর মুখ। হাত পিছ মোড়া করে বাঁধা থাকায় সে একটুও নড়াচড়া করতে পারছে না। তাছাড়া কিইবা করবে সে. মৃত্যু যে আসন্ন তা যেন সে পূর্ব হইতেই বুঝতে পারছে।

লোক দু'জন একেও শুইয়ে দিলো টেবিলে।

হাতের বাঁধন মুক্ত করে দেবার পূর্বে একেও একটা ইনজেকশান পুশ করলো হামবার্ট। লোকটা পূর্বের লোকের মতই আর্তনাদ করে পরক্ষণেই নীরব হয়ে গেলো। স্থির হয়ে এলো ওর দেহটা।

হামবার্ট পূর্বের সেই রক্ত মাখা ছুরিখানা তুলে নিয়ে এর বুকটাও চড়চড় করে চিরে ফেললো তারপর ক্ষিপ্র হাতে বুকের ভিতর থেকে বের করে আনলো হৃদপিণ্ডটা। এই হৃদপিণ্ডটা তুলে নিয়ে রাখলো অপর একটি কাঁচ পাত্রে তারপর পূর্বের হৃদপিণ্ডটা তুলে নিয়ে এই সংজ্ঞাহীন লোকটার বুকে সংযোজনের চেষ্টা চালালো হামবার্ট। তাকে সহায়তা করে চললো তার সঙ্গী দু'জন!

প্রায় ঘন্টা দুই ধরে এসব চললো।

কক্ষ মধ্যে তখন পাওয়ার ফুল বাল্ব জ্বলছে।

নরপিশাচ হামবার্টের ললাটে ঘাম ফুটে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার এ হত্যা যজ্ঞের সাধনা চললো। তারপর বললো তার সঙ্গীদের লক্ষ করে—নিয়ে যাও লাশ দু'টো ফেলে দিয়ে এসো। এক নম্বর হিপিংকার বাইরে অপেক্ষা করছে।

হামবার্ট মুখের মাস্ক এবং হাতের গ্লাভস খুলে রেখে যে পথে এসেছিলো সেই পথে বেরিয়ে গেলো।

অদূরে হাত এবং চোখ বাঁধা লোকগুলোর অবস্থা শোচনীয়। আজ তাদের মধ্যে থেকে দু'জন কমে গেলো, কাল আবার কার ভাগ্যে এ হিসাবের অঙ্ক পড়বে কে জানে, চিৎকার করে কাঁদলেও তাদের পরিত্রাণ নেই, তাই কাঁদে না ওরা।

হামবার্ট চলে গেলে তার সঙ্গীদ্বয় মৃতদেহ দু'টো ষ্ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল ফাঁক হলো সেই পথে লোক দু'জন একটি লাশ নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বাইরে একটি সুড়ঙ্গ পথ ঐ পথে কিছুটা অগ্রসর হয়ে একটি লৌহ দরজা। ঐ দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ষ্ট্রেচার হাতে লোক দু'জন।

অদূরে একটি গাড়ি অপেক্ষা করছে।

গাড়িখানা অদ্ভুত ধরণের।

গাড়ির গায়ে লিখা আছে ১নং হিপিংকার।

হামবার্টের লোক দু'জন পর পর লাশ দুটো এনে ঐ ১নং হিপিং গাড়িতে তুলে দেয়।

গাড়িখানা চলে যায় পর্বতের কোন এক সুড়ঙ্গ পথ ধরে গোপন স্থানে।

হামবার্ট তখন তার বিশ্রাম কক্ষে মদের বোতল আর কাঁচ পাত্র নিয়ে মেতে উঠেছে!

নেশায় চুর চুর হয়ে হামবার্ট টলতে টলতে এগিয়ে যায় সে পাশের দরজার দিকে। ও পাশে আর একটি গুহা, তার বিশ্রাম এই গুহাটা। এ সব গুহা মধ্যে কোন বৈদ্যুতিক আলো নেই। মশাল জলছে।

হামবার্ট এই গুহার প্রবেশ করতেই একটি ঘন্টা ধ্বনি হয়।

সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক এসে কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়ায়।

হামবার্ট তাকে লক্ষ্য করে কিছু ইংগিৎ করে।

লোকটা চলে যায়।

হামবার্ট টলতে টলতে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

একটু পরেই দু'জন লোক একটি তরুণীকে টানতে টানতে নিয়ে আসে সেই কক্ষে।

তরুণীর পরনে ঘাগড়া। গায়ে পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবীর গলায় এবং বুকে জরির কাজ করা রয়েছে। মাথার চুলগুলো দু'পাশে বিনুনী করা। নিশ্চয়ই কোন ইরানী মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

হামবার্টের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো লোক দু'জন ইরানী তরুণীটিকে।

হামবার্ট এর চোখ দুটো তরুণীটিকে লক্ষ্য করে জ্বলে উঠলো, লোভ আর লালাসায় উঠে দাঁড়ালো সে।

পা দু'খানা তার সমান নয় তাই একটু কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলো তরুণীটর দিকে।

তরুণী আর্তনাদ করে উঠলো—না না আমাকে তোমরা নিয়ে চলো.....আমাকে তোমরা নিয়ে চলো....

কিন্তু ততক্ষণে হামবার্ট তরুণীকে ধরে ফেলেছে।

লোক দু'জন তরুণীকে হামবার্টের হাতে তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে গুহা থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে দপ করে নিভে গেলো মশালের আলো।

হামবার্টের লালসা পূর্ণ জড়িত কণ্ঠস্বর—মেরী পিয়ারী মেরী জান....

জমাট অন্ধকার ভেদ করে শোনা গেলো অসহায় নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ।

❑

দিনের পর দিন এমনি কত অসহায়া তরুণীর সর্বনাশ হামবার্ট করে চলেছে তার হিসাব নেই।

প্রতিদিন একটি দুটি তরুণীকে হামবার্টের লোক ফুসলিয়ে নিয়ে আসে। কাউকে শাড়ি গহনার লোভ দেখিয়ে। কাউকে খাদ্যের বিনিময়ে। কাউকে অর্থের মোহে।

হামবার্টের লোকজন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ।

গুহার এক গোপন স্থানে বহু তরুণীকে আটক করে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে ঝিন্দ বাসিনী, ইহুদী, আরবী, ইরানী, এমন কি বহু বাঙ্গালী তরুণীও আছে।

হামবার্ট এদের ইচ্ছা মত ব্যবহার করে।

যারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে তাদের পাহাড়ের কোন এক গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে নর পিশাচ হামবার্টের অনুচরগণ। হত্যা করার পর ছুড়ে ফেলে দেয় কোন অন্ধ গহ্বরে। কেউ কোনদিন এই সব অসহায়া তরুণীদের সন্ধান পায় না।

এতো নারীর সর্বনাশ করেও হামবার্ট খুশি হতে পারেনা সদা সর্বদা আমির আলীর কন্যা নীলার জন্য উন্মাদ। যেমন করে হোক নীলাকে তার চাই।

শুধু নীলার জন্যই আমির আলী সাহেবের জীবনে এসেছে চরম এক বিপর্যয়।

আমির আলী তাদের ব্যবসার প্রথম সহকর্মী। শুধু তাই নয় তিনি নিজেও একজন দক্ষ চক্ষু এবং রক্ত শোষক বৈজ্ঞানিক ছিলেন। একারণেই জঙ্গল বাড়ি ঘাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিলো। লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি পেতেন জঙ্গল বাড়ি ঘাটি থেকে।

যখন আমির আলীর সঙ্গে হামবার্টের গভীর সম্বন্ধ, তখন একদিন শিশু কন্যা নীলাকে হামবার্ট দেখে। ছোট ফুট ফুটে মেয়েটি প্রথম নজরেই তার লালসাপূর্ণ মনটাকে আকৃষ্ট করে তারপর থেকে হামবার্ট নীলার জন্য প্রতিক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু সে নীলাকে হাতের মুঠায় পেয়েও যেন পায়না। আমির আলীকে হামবার্ট বহুদিন ধরে নীলা সম্বন্ধে বলে আসছে তবু কোন ফল হয়নি। আমির আলী নীলার বিনিময়ে নীল পাথর চায়,হামবার্ট তাতে রাজি নয়। এবং এ

কারণেই তাদের মধ্যে একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয় শুরু হয় ভীষণ অবস্থা। যার পরিণতি দাঁড়ায় জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস স্তূপ।

শয়তান হামবার্টের জঙ্গল বাড়ি ধবংস স্তূপে পরিণত হলেও তার প্রসার ছিলো কান্দাই পর্বতমালার বহুদূর নিয়ে। জঙ্গল বাড়ির মাটির বাইরে কান্দাই পর্বতমালার তলদেশে গোপন গুহায় তার এই বিশ্রাম কক্ষ। এবং এখানে তার হৃদপিণ্ড অপারেশন থিয়েটার। এ ছাড়াও আরও কতকগুলো গুহা ছিলো যার মধ্যে রয়েছে তার নানা রকম কু'কর্মের সরঞ্জাম।

একটি গোপন গুহায় কতকগুলো অসহায়া তরুণীকে অটকে রাখা হয়েছে। যখন যাকে প্রয়োজন হামবার্ট তার উপর চালায় পাশবিক অত্যাচার। একটি গুহায় তরুণ যুবকদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, হামবার্ট ইচ্ছা মত এদের হৃদপিণ্ড নিয়ে অপারেশন পরীক্ষা চালায়।

শয়তান হামবার্ট তার জঙ্গল বাড়ি ঘাটি হারিয়েও দমে যায়নি। যদিও সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বরং সে আরও বেশি শয়তান হয়ে উঠেছে জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস হওয়ায়! কেমন করে সে আমির আলীকে চরম শাস্তি দেবে। কেমন করে সে নীলাকে নিজস্ব করে নেবে। কেমন করে ধ্বংস করবে আমির আলীর গবেষণাগার।

হামবার্টের আর একটি নতুন চিন্তা দস্যু বনহুর। এবার তার সংগ্রাম দস্যু বনহুরের সঙ্গে।

❑

নীলা এখানে আসার পর তার কোন অসুবিধা হয়নি। সকালে চোখ মেলতেই বেডটি, পরিচ্ছন্ন নাস্তা। দুপুরে পুষ্টিকর খাদ্য সম্ভার। রাতেও সে যা ভালবাসে সেই খাবার। এমন কি নীলা কফি খেতে ভালবাসে, কফি সে না চাইতেই পায়। নীলা অবাক হয়ে ভাবে দস্যু বনহুর কি তার সব কিছু জানে যে সেইভাবে এখানে ব্যবস্থা করে রেখেছে। এখানে তার কোন আদেশ করতে হয়না, যখন যা প্রয়োজন মনে করে তাই সে পেয়ে যায়।

এখানে আসার পর নীলার ভীষণ একটা আতঙ্ক ছিলো দস্যু বনহুর তাকে না জানি কি ভাবে হয়রানি পেরেশানী করবে। কিন্তু ক'টা দিন কেটে গেলো দস্যু বনহুরের সাক্ষাৎ পায়নি সে। দু'জন লোক তার আদেশ পালনে সব সময় হাজির থাকে তারা অতিভদ্র এবং নম্র ভাবে কথা বার্তা বলে।

মাঝে মাঝে নীলা তার আব্বুর সঙ্গে দেখা করে। আব্বুর সঙ্গে অনেক কথা হয়। আমির আলী সাহেব বলেন—মা নীলা বেশ আছি। সংসারের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন কাজ, প্রচুর অবসর। জীবনকে এমনভাবে উপভোগ করার সুযোগ আমি পাইনি কোন দিন।

পিতার কথায় নীলা খুশি হতে পারেনা কারণ এমন বন্দী জীবন তার কাছে অসহ্য লাগে। বিশেষ করে রংলালের জন্য মনটা তার সব সময় উদাসীন, একদিন রংলালকে না দেখলে নীলার হৃদয় অন্ধকারে ভরে উঠতো আর আজ ক'দিন সে তাকে দেখতে পায়নি।

নীলা পিতার কথায় বলে—আব্বু আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছেনা!

কেনো মা তোমার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে? বললো আমির আলী সাহেব।

নীলা বললো—না আব্বু কোন অসুবিধা এখানে হয়নি তবে সব সময় আমার মনে ভয় আর দুঃর্ভাবনা....

আমির আলী সাহেব কন্যার কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—মরার আবার খাঁড়ার আঘাত কি মা। তুই আর আমি মরেই তো গিয়েছিলাম। জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে হামবার্ট আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলো কিন্তু দস্যু বনহুরের দয়ায় আমরা জীবনে বেঁচে আছি এটাই তো আমাদের জীবনের পরম ভাগ্য....

আব্বু তুমি বুঝতে পারছোনা উদ্দেশ্য বিহীন কেউ কোন কিছু করেনা। তোমাকে আর আমাকে রক্ষা করার পিছনে নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের কোন স্বার্থ আছে।

তা ঠিক কতখানি সত্য আজও বুঝতে পারছি না। শুনেছি দস্যু বনহুর অতি ভয়ঙ্কর অতি সাংঘাতিক কিন্তু আজও আমি তার মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পাইনি মা।

উদ্দেশ্য সফলের সময় এলেই বুঝতে পারবে। আব্বু আমি নিজকে আর সংযত রাখতে পারছিনা। একটা ভয় আর আতঙ্ক আমাকে অহরহঃ যন্ত্রণা দিচ্ছে। না জানি কখন কোন মুহূর্তে দস্যুটা আমাদের উপর অত্যাচার চালাবে।

মিছে মিছে ভয় পাচ্ছিস নীলা।

না আব্বু মিছে মিছি নয় দেখো দস্যু বনহুর যেদিন তার নগ্ন রূপ উন্মোচন করবে সেদিন তাকে সাধু ভাবতে পারবেনা আর।

পিতা পুত্রি এমনি অনেক কথা হয়।

কোনদিন বলে নীলা—আব্বু চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই।

আমির আলী সাহেব বলেন—কোথায় যাবি মা? জানিস যেখানে যাবো সেখানেই হামবার্টের শ্যেন দৃষ্টি আমাদের পিছু নেবে। ঐ শয়তানটার কবল থেকে রক্ষা পাবো বলে আশা ছিলোনা আমাকে হত্যা করে তোকে সে হরণ করবে। নীলা হামবার্টের হাত থেকে তোকে রক্ষা করার উপায় আমার ছিলোনা যদি সেই মুহূর্তে দস্যু বনহুর গিয়ে না পৌঁছতো। মা তুই যাই বলিস আমি কিন্তু দস্যুটাকে সমীহ করি শ্রদ্ধাও করি...

আব্বু...

হাঁ মা।

নীলা এরপর পিতার কক্ষে আর বিলম্ব করেনি, সে অভিমানে ফিরে এসেছিলো নিজের ঘরে। তার আব্বু দস্যু বনহুরকে সমীহ করে এমন কি শ্রদ্ধাও করে। একটা দস্যুর প্রতি এতোখানি অনুরাগ নীলার পছন্দ হয়না।

নিজের কক্ষে ফিরে এসে নীলা গম্ভীর মুখে বসে থাকে।

দস্যু বনহুরের একজন অনুচর এসে বলে—আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।

টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে যাও। নীলা কথাটা বলে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

একটু পরে আর একজন এসে বলে—খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো খাবেন কখন?

নীলা বললো—যখন আমার ইচ্ছা খাবো। তোমরা যাও।

চলে যায় লোকটা।

ঘন্টা কয়েক কেটে যায়।

রাত বাড়তে থাকে।

আবার একজন আসে—এখনও খাননি? উঠুন—খেয়ে নিন।

খাবো না যাও।

কেনো খাবেন না?

বিরক্ত করো না যাও বলছি।

আপনি না খেলে সর্দার আমাদের উপর রাগ করবেন।

আমি না খেলে তোমাদের সর্দারের কি এসে যাবে। আমি যাবোনা। তোমরা আর বিরক্ত করতে এসোনা।

আচ্ছা যাচ্ছি।

অনুচরদ্বয় বেরিয়ে যায়।

নীলা দরজা বন্ধ করে দেয় যাতে ওরা আর আসতে না পারে। দরজা বন্ধ করে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে নীলা, কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুর।

জমকালো পোশাক পরা। পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। পায়ে হাটু অবধি ভারী বুট। কক্ষের বৈদ্যুতিক উজ্জল আলোতে দস্যু বনহুরের বুট দুটো চক চক করছে।

নীলার মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। সে দরজা বন্ধ করে দিলো কিন্তু দস্যু বনহুর এলো কি করে? নীলা আড়ষ্ট হয়ে যায় একেবারে।

বনহুর দু'পা এগিয়ে আসে।

নীলা ভীতভাবে পিছু হটে যায়।

বনহুর বলে—মিস নীলা বলেছিলাম আবার আসবো তাই এসেছি। শুনলাম কাল থেকে আপনি অনাহারে রয়েছেন! কিন্তু কেনো?

নীলা বলে উঠে—আমি না খেলে তোমার কি এসে যায়? আমি খাবোনা?

কেনো সে কথা আমাকে বলতে হবে?

আমি তোমাকে কোন কথা বলতে রাজি নই।

একটু হাসে বনহুর—জানো তুমি এখন কোথায়?

জানি দস্যু বনহুরের বন্দীশালায়।

এবার অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আমার বন্দীশালায় মিস নীলার বুঝি খুব অসুবিধা হচ্ছে।

নীলা কোন জবাব দেয়না।

বনহুর বলে—জানি অসুবিধা কি—এবং কোথায়। তবু বাধ্য হয়ে আমি আপনাদের এখানে এনেছি। হামবার্ট শুধু আপনার পিতাকেই হত্যা করতোনা। সে আপনাকে আত্মসাৎ করতো। মিস নীলা আপনি কোনটা চান হামবার্টের কাছে আত্মসম্পর্ণ না দস্যু বনহুরের বন্দীশালায় আত্মগোপন?

নীলা চোখ তুলে তাকালো দস্যু বনহুরের চোখ দু'টোর দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বনহুর।

নীলার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো। কোন কথা বললোনা।

বনহুর আবার বলে উঠে—আপনি নীরব রইলেন, এতে আমি বুঝবো আপনি আমার বন্দীশালা থেকে মুক্তি চান।

হাঁ আমি মুক্তি চাই। আমার বাড়িতে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

বাড়িতে যাবার সখ দেখছি অত্যন্ত কিন্তু মনে রাখবেন যার জন্য আপনি সে বাড়িতে যেতে চাই. ন সেই রংলাল নেই।

বিস্ময় ভরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে নীলা—রংলাল নেই?

না।

সে কোথায় গেছে বলতে পারো?

হাঁ।

বলো—বলো কোথায় গেছে রংলাল? কেনো গেছে সে?

তাকে হামবার্টের লোক ধরে নিয়ে গেছে।

আর্তকণ্ঠে বলে উঠে নীলা—রংলালকে হামবার্টের লোক ধরে নিয়ে গেছে।

হাঁ মিস নীলা।

কেন কি জন্য তাকে সে ধরে নিয়ে গেলো? বলবে আমাকে?

নিশ্চয়ই বলবো!

বলো? বলো? নীলা আগ্রহ ভরা কণ্ঠে বলে উঠে।

বনহুর বলে এবার—হামবার্ট জানে আপনি ঐ যুবকটাকে ভালবাসেন। সে থাকতে আপনাকে হামবার্ট পাবেনা এটাও সে জানে ভালভাবে। কাজেই রংলালকে সরানো ছাড়া তার কোন উপায় ছিলোনা। শুধু তাই নয় রংলালকে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবে....

না না এ হতে দেবোনা! দস্যু বনহুর তুমি পারবেনা আমার রংলালকে হামবার্টের কবল থেকে উদ্ধার করতে? তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেবো।

বনহুর এবার মেঝেতে পায়চারী করে চলে।

নীলা আরও সরে আসে বনহুরের পাশে। করুণকণ্ঠে বলে—বলো তুমি কি চাও?

যদি বলি আমি তোমাকে চাই।

মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠে নীলার মুখমণ্ডল। অধর দংশন করে বলে সে—জানি তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে এনেছো? কিন্তু মনে রেখো তোমার আশা পূর্ণ হবেনা।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায় নীলার দিকে—হুঁ বেশ কথা বলছেন দেখছি! দস্যু বনহুরের বন্দীশালায় বন্দিনী থেকে এমন ধরণের কথা বলতে পারলেন। জানেন এখানে আপনাকে রক্ষা করে এমন একটি প্রাণী নেই।

নীলার মুখভাব করুণ হয়ে উঠে, ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলে—দস্যু বনহুর তুমি আমাকে হামবার্টের কবল থেকে রক্ষা করেছো। এমন কি মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছো, আমি তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।

কৃতজ্ঞতা দস্যু বনহুর চায়না। মিস নীলা, আমি পূর্ব হতেই বলেছি রংলালকে আপনার ভুলতে হবে। হামবার্ট ওকে হত্যা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠে নীলা—আমি ওকে ছাড়া বাঁচবোনা। দস্যু বনহুর তুমি আমাকে হামবার্টের ওখানে নিয়ে চলো....

ইজ্জতের বিনিময়ে আপনি রংলালকে ফিরিয়ে নিতে চান মিস নীলা?

বলো আমি কি করবো এখন? দস্যু বনহুর তুমি আমাকে বলে দাও?

আমি বলেছি রংলালের মোহ আপনি ত্যাগ করুন।

নীলা বনহুরের পা দু'খানা চেপে ধরে বলে উঠে—আমি পারবোনা আমাকে মাফ করো....ওকথা আর তুমি বলোনা.....আমি সহ্য করতে পারি না দস্যু বনহুর....

হামবার্ট যদি তাকে হত্যা করে ফেলে?

আমি বাঁচাবোনা। দস্যু বনহুর তুমি আমাকে হত্যা করে ফেলো তবু আমি ওকে ভুলতে পারবোনা....

তা হলে আপনি হামবার্টের হাতে নিজকে সমর্পণ করে, তবু রংলালকে ফিরিয়ে আনতে চান?

নীলা কোন কথা বলেনা, নীরবে সে বনহুরের পায়ের কাছ হতে উঠে দাঁড়ায়।

বনহুর বলে—এখন আমি যাচ্ছি, আপনি নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে চান, না রংলালকে ফিরিয়ে চান, মনস্থির করে বলবেন। কিন্তু আপনি খেয়ে নেবেন।

বনহুর পিছন দেয়ালের পাশে গিয়ে একটা চাকতীর মত জিনিসে চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল খানার মধ্যে একটি ছোট দরজা বেরিয়ে আসে। বনহুর সেই পথে বেরিয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

নীলা চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে।

টেবিলে খাবার তেমনি পড়ে থাকে।

সমস্ত রাত নীলা অশ্রু বিসর্জন করে কাটায়।

ভোরে ঘুমিয়ে পড়ে এক সময় সে।

নীলা আর আমির আলী সাহেব যখন বনহুরের কান্দাই শহরের আস্তানার গোপন কক্ষে নিদ্রায় মগ্ন তখন হামবার্টের তিনজন সহকর্মী আমির আলী নীলার সন্ধানে কান্দাই শহরে তাদের বাস ভবনে এসে হাজির।

তিনজন সহকর্মীদের মধ্যে মাদার্ন নিজেও আছে।

রবার কোম্পানীর এজেন্ট এর বেশেই .এরা আজ এসেছিলো আমির আলী সাহেবের বাস ভবনে।

কিন্তু একি মাদার্নের মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়লো। আমির আলী এবং নীলা কেউ নেই বাসভবনে। দারওয়ান তিন জনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো মাদার্ন—তোমাদের সাহেব এবং মেম সাহেব কোথায় গেছে বলতে পারো? আমরা রবার কোম্পানী থেকে এসেছি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো আমাদের কোম্পানী দেখার জন্য। অবশ্য আমির আলী সাহেবকে পূর্বেই একথা বলে গিয়েছিলাম।

মাদার্নের কথার জবাবে বলে পুরোন দারওয়ান শেঠজী—হুজুর সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আমরা রাতে পাহারা দিচ্ছি যেমন রোজ রোজ দেই। গভীর রাতে হঠাৎ আমার পিছনে কেউ যেন এসে দাঁড়ালো। আমি যেমন ফিরে তাকিয়েছি অমনি দেখলাম একটা জমকালো পোশাক পরা লোক, লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরে ফেললো। সেকি অসীম শক্তি তার শরীরে আমি একটুও নড়তে পারলামনা, জমকালো পোশাক পরা লোকটা আমার মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে হাত দু'খানা পিছুমোড়া করে বেঁধে ফেললো তারপর আমাকে কাঁধে উঠিয়ে গ্যারেজের মধ্যে নিয়ে গেলো! সেখানে এনে আমাকে ফেলে দিলো ধপ করে। আমি, আমি কোন নরম জিনিসের উপর এসে পড়লাম। পরদিন ভোরে দেখি আমার দেহের নিচে বাড়ির আরও দু'জন দারওয়ান হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

মাদার্নের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠে। শুধু বিস্ময় নয় একটা দারুন ভয়। বলে সে—তাদের কি তবে কেউ ধরে নিয়ে গেছে?

ঠিক বলতে পারছিনা হুজুর কারণ আমরা সকালে শুনতে পাই মালিক এবং তার কন্যা নীলা আপামনিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

এ সংবাদ নিয়ে মাদার্নও তার সঙ্গীদ্বয় ফিরে যায় কান্দাই পর্বত মালার সেই গোপন ঘাটিতে?

হামবার্ট বিপুল উন্মাদনা আর লালসা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। সে জানতো মাদার্ন কোন মতেই রিক্ত হাতে ঘুরে আসবেনা।

মাদার্ন ও তার সঙ্গীদ্বয় যেমন শুন্য হাতে ফ্যাকাশে মুখে নর শয়তান হামবার্টের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি ভয়ঙ্করভাবে গর্জে উঠে হামবার্ট—শিকার কই?

মাদার্ন হাতের মধ্যে হাত কচকে বলতে গেলো—তারা নেই....

মাদার্নের মুখের কথা শেষ হলোনা হামবার্টের হাতের ছোরাখানা বিদ্ধ হলো তার বুকে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠলো মাদার্ন দু'হাতে সে বুকটা চেপে ধরলো শক্ত করে।

হামবার্ট ছোরাখানা একটানে তুলে নিলো।

সঙ্গে সঙ্গে টলতে লাগলো মাদার্নের দেহটা, তারপর চীৎ হয়ে পড়ে গেলো পাথুরে মেঝেতে।

হামবার্ট এবার মাদার্নের সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললো—তারা নেই তবে গেলো কোথায়?

ভয়ে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

একজন বললো—জমকালো পোশাক পরা একটা লোক আমির আলী ও তার কন্যা নীলাকে ধরে নিয়ে গেছে!

হামবার্ট চিৎকার করে উঠে—কি বললে আলী আর নীলাকে একটি জমকালো পোশাক পরা লোক ধরে নিয়ে গেছে?

হাঁ মালিক।

হামবার্ট মাটিতে পদাগাত করে বলে উঠে—দস্যু বনহুর। দস্যু বনহুর আলী আর নীলাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি নীলাকে তার প্রয়োজন। নরাধম জানেনা হামবার্টের মুখের শিকার কেড়ে নিয়ে সে বাঁচতে পারবেনা....আমি তাকে দেখে নেবো কত বড় দুঃসাহসী দস্যু সে।

এমন সময় গোংলাইসিং একটা পুটলী হাতে ভিতরে প্রবেশ করে সেলুট দিয়ে দাঁড়ায়—মালিক!

হঠাৎ তার নজর পড়ে মাদার্নের রক্তাক্ত দেহটার দিকে। আরষ্ট হয়ে যায় সে মুহূর্তের জন্য।

হামবার্ট ধমক দিয়ে বলে—কি সংবাদ গোংলাইসিং?

মালিক এনেছি।

কি এনেছো?

রংলাল কে....

রংলাল! কোথায় রংলাল?

সর্দার তাকে জীবন্ত আনতে পারিনি তার মাথাটা.....

জীবন্ত আনতে পারোনি তার মাথা কেটে নিয়ে এসেছো?

হাঁ—হাঁ মালিক তাই এনেছি। আপনি তো বলেছিলেন মাদার্ন আনবে আলী আর নীলাকে আর তুমি আনবে—রংলালকে, তাই এনেছি.....এই দেখুন রংলালের মাথাটা আমি কেটে এনেছি।

গোংলাইসিং পুটলীটা খুলে মেলে ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে হামবার্ট বলে—বেশ করেছো গোংলাইসিং তুমি ভাল কাজ করেছো। এই নরপশুটা নীলার মন জয় করে নিয়েছিলো।

হামবার্ট খণ্ডিত মস্তকটায় পদাঘাত করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

খণ্ডিত মস্তকটা গড়িয়ে পড়লো হামবার্টের পায়ের এক পাশে। এখনও গলাটায় চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চোখ দুটো মুদিত, চুলগুলো এলো মেলো।

❑

আমির আলী সাহেবের বাড়িতে মহা হই-চই পড়ে গেলো আমির আলী এবং নীলা হঠাৎ উধাও হওয়ার খবর পেয়ে আমির আলী সাহেরব ভ্রাতুষ্পুত্র হাসিম কায়েসী এসেছিলো ফাংহা থেকে। এতো বড় বাড়ি প্রচুর ধনসম্পদ এখন তাকেই দেখাশোনা করতে হবে। কিন্তু সেই রাতে সে নিহত হয়েছে। কে বা কারা তার দেহ থেকে মাথাটা কেটে নিয়ে গেছে।

শিক্ষিত সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবক হাসিম কায়েসীর অনেক আশা চাচা আমির আলীর অনুপস্থিত কালে তার বিপুল ঐশ্বর্য যেন বিনষ্ট না হয় তাই সে সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিলো সুদূর ফাংহা থেকে।

হাসিম কায়েসী সবেমাত্র বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে কান্দাই ফিরে এসেছিলো। বৃদ্ধ পিতা জায়েদ কায়েসী ফাংহায় থাকেন। হাসিম কায়েসী বিদেশ থেকে ফিরে পিতার কাছে গিয়েছিলো বেড়াতে। সেখানেই সে তার

কর্ম জীবন শুরু করবে ভাবছিলো এমন সময় আমির আলীর ম্যানেজার মনি খার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসে কান্দাই।

কান্দাই এসে হাসিম কায়েসী সব শুনে গভীর দুঃখে ভেংগে পড়ে। কারণ তার চাচা আমির আলী সাহেব তাকে নিজ পুত্রের মতই স্নেহ করতেন চাচারও বড় আশা তার অবর্তমানে হাসিম তার বিশাল ঐশ্বর্যের অধিপতি হবে। নীলাকেও সঁপে দেবেন তিনি হাসিমের হাতে।

চাচা আমির আলী এবং নীলার হঠাৎ উধাও ব্যাপার নিয়ে হাসিম এসেই নানাভাবে খোঁজ খবর শুরু করেছিলো। পুলিশ মহলকেও সে এ ব্যাপার নিয়ে দারওয়ানদের কাছে শোনা কথার উপয় ভিত্তি করে সব জানিয়েছিলো এবং যাতে তাঁদের খুঁজে বের করা হয় এ জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো।

সমস্ত দিন গাড়ি নিয়ে নিজেই ছুটোছুটি করেছিলো বেচারী। সন্ধ্যার পর সে পুলিশ অফিস থেকে ফিরে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে তাই সকাল সকাল চারটি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলো হাসিম।

কিন্তু আর সে ভোরের সূর্য দেখতে পেলোনা।

চাকর বাকর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো এতক্ষণও হাসিম উঠছেনা দেখে। টেবিলে নাস্তা দেওয়া হয়ে গেছে! চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তবু ঘুম ভাংছেনা তার।

ম্যানেজার মনি খাঁ বার বার দরজার পাশে এসে ঘোরাঘুরি করছে কারণ সকালে ব্রেক ফাষ্ট করার পর তাদের পুলিশ অফিসে যাওয়ার কথা আছে কিন্তু বেলা অনেক হয়ে এলো এখনও জাগছেনা হাসিম কায়েসী।

মনি খাঁ ভাবছেন এসে অবধি অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন তাই ঘুম ভাংতে হাসিম কায়েসীর এতো বিলম্ব হচ্ছে।

কিন্তু আরও বেলা যখন বেড়ে গেলো তখন মনি খাঁ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

হঠাৎ এমন সময় তার কানে আসে মালির চিৎকার—রক্ত....রক্ত ...রক্ত.....

এক দণ্ডে লোকজন ছুটে যায় বাগানের মধ্যে।

মালি আংগুল দিয়ে বাগানের মধ্যে হাসিম কায়েসীর কক্ষের পিছন জানালটা দেখিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ঐ জানালায়। ভয়ে আতঙ্কে সবাই চমকে উঠে। দেখতে পায় জানালায় জমাট রক্তের ছাপ। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে।

ম্যানেজার মনি খাঁ ছুটলেন কক্ষের সম্মুখের দিকে।

দরজা ভেংগে খোলার আদেশ দিলো সে।

অল্পক্ষণেই দরজা ভেংগে ফেলা হলো।

এক সঙ্গে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলো অনেকে। মনি খাঁ সবার আগে।

বিছানার পাশে এসে চিৎকার করে উঠলো মনি খাঁ—খুন, হাসিম সাহেব খুন হয়েছেন...

সবাই তাকিয়ে দেখলো বিছানায় মস্তক হীন হাসিম কায়েসীর দেহটা পড়ে আছে। রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে বিছানা আর বালিশটা।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করলো মনিখাঁ।

অল্পসময়ের মধ্যে পুলিশ সুপার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টার কতকগুলো পুলিশ সহ আলি সাহেবের বাসভবনে এসে পড়লেন।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা উধাও ব্যাপার নিয়ে এই হত্যা রহস্য সম্বন্ধে সব কথা শোনার পর পুলিশ সুপার ও পুলিশ ইন্সপেক্টার বুঝতে পারলেন এটা দস্যু বনহুরের কাজ। কারণ দারওয়ানগণ যে বর্ণনা দিলো তাতে স্বয়ং দস্যু বনহুর ছাড়া এ কাজ অন্য কেউ করেনি বলেই প্রমাণিত হলো।

পরদিন এই সংবাদ কান্দাই পত্রিকায় বিরাট কলেবরে প্রকাশিত হলো।

কান্দাইবাসীগণের মনে আবার সৃষ্টি হলো নতুন এক আতঙ্ক। শহরের সর্বত্র ত্রাসের সৃষ্টি হলো, বন্ধ কক্ষে মস্তকহীন দেহ কম কথা নয়।

এ সংবাদ এক সময় চৌধুরী বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো।

নূর পত্রিকা হাতে মায়ের কাছে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—আম্মি আম্মি দেখো আবার দস্যু বনহুর হত্যা লীলা শুরু করেছে।

মনিরা পুত্রের কথায় কোন জবাব না দিয়ে ওর হাত থেকে পত্রিকা খানা নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে।

“কান্দাই শহরে আবার ত্রাসের সঞ্চার’

দস্যু বনহুরের নৃশংস হত্যা লীলা!

কয়েকদিন পূর্বে দস্যু বনহুর শহরের ধনবান ব্যক্তি

খান বাহাদুর আমির আলী কায়েসী ও তার কন্যা

মিস লীলাকে তাদের বাস ভবন থেকে উধাও করেছে।
দস্যু বনহুর শুধু তাদের হরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি
সে খান বাহাদুর আমির আলীর ভ্রাতুস্পুত্র মিঃ
হাসিম কায়েসীকে অদ্য রাত্রিতে তার শয়ন কক্ষে হত্যা
করে তার দেহে থেকে মাথাটা দ্বিখণ্ডিত করে নিয়ে
গেছে। কক্ষ মধ্যে মস্তকহীন অবস্থায় মিঃ হাসিম
কায়েসীকে পাওয়া গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে
জোর তদন্ত শুরু করেছে এবং শহরবাসীকে সজাগ
থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।
কান্দাই সরকার দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য দুই লক্ষ
টাকা পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন এবার তার পরিমাণ
তিন লক্ষ টাকা করা হয়েছে।"

একবার নয় দু'বার তিন বার পড়লো মনিরা সংবাদ পত্রের লেখাগুলো। গভীর একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে।

নূর বলে উঠলো আম্মি তুমি বিশ্বাস করতেই চাওনা, দেখলে তো দস্যু বনহুর কোনদিন সৎ ও মহৎ হতে পারেনা।

মনিরার মনে পড়ে কয়েকদিন আগে নূর তার পাশে শুয়ে শুয়ে কি যেন গল্প করছিলো কথায় কথায় দস্যু বনহুরের কথা তোলে নূর। মনিরা বলেছিলো, নূর তুই জানিস না বাপ দস্যু বনহুর মোটেই অসৎ নয়।

নূর আরও অনেকদিন দস্যু বনহুর সম্বন্ধে মায়ের মুখে এই ধরনের উক্তি শুনেছিলো তাই আজ সে বলে বসে শুধু তাই নয় আম্মি দস্যু বনহুর হীন জঘন্য...

মনিরার সহ্যের বাঁধ ভেংগে যায়, চিৎকার করে বলে—নূর! চুপ কর...

আম্মি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে তার জঘন্য ঘৃন্য আচরণ সম্বন্ধে জেনেও তুমি তা অস্বীকার করতে চাও। এই দস্যুটার জন্য কান্দাই-এর লোকের মনে কোন শান্তি নেই স্বস্তি নেই।

মনিরা এবার শান্ত কণ্ঠ বলে এ সব কথা ভুলও হতে পারে!

তুমি কিছু বুঝনা আম্মি সংবাদ পত্রে এমন ভুল কোন দিন হতে পারে না। যাই বলো বড় হয়ে এই দস্যুকে আমি সায়েস্তা করবো। তুমি দেখে নিও।......

নূর...

মনিরা!

চমকে ফিরে তাকায় মনিরা—তুমি!

সঙ্গে সঙ্গে নূর আনন্দ ধ্বনি করে উঠে—আব্বু।

বনহুর নূরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ওর গালে ছোট্ট একটু চুমু দিয়ে বলে—মা ছেলে মিলে খুব ঝগড়া হচ্ছিলো বুঝি।

নূর বলে দেখোনা আব্বু আম্মি কিছুতেই দস্যু বনহুরকে অসৎ বলতে দেবেন না। আব্বু জানো আজ রাতে সে একটা বাড়িতে ঢুকে একটি নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে আর তার মাথাটা কেটে নিয়ে গেছে।

হ্যাঁ আব্বু আমি সংবাদ পত্রে দেখেছি।

বলোতো কত বড় হৃদয়হীন এই দস্যুটা।

মনিরা বলে উঠে—নূর এখন পড়বে যাও।

নূর বলে এখন বুঝি পড়ার সময়।

বনহুর একটু হেসে বলে তাইতো এখন কি পড়াশোনা করার সময়। তুমি খেলতে যাও আব্বু কেমন?

আব্বু আজ কিন্তু তোমাকে যেতে দেবোনা।

কেনো?

আমাদের ফুটবল খেলা আছে তুমিও যাবে আমাদের খেলা দেখতে।

আচ্ছা যাবো।

নূর চলে যায়।

মনিরা মুখ গম্ভীর করে নিজের ঘরে প্রবেশ করে।

বনহুর মনিরাকে অনুসরণ করে তার পিছনে পিছনে এগিয়ে যায়—মনিরা।....

আর কতদিন এসব শুনতে হবে বলো? লোকের মুখে শুনে শুনে ঝাঁজরা হয়ে গেছি এখন পেটের ছেলের মুখে....

মনিরা তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছো

তুমি ছাড়া এমন জঘন্যতম কাজ কে করবে বলো? শুধু হত্যাই নয় নারী হরণ শুরু করেছো আজ কাল...

মনিরা।

তুমি গোপন রাখতে চাইলেও গোপন নেই কোন কথা। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। এর চেয়ে তুমি আমাকে হত্যা করে সব জালা

মিটিয়ে দাও। তোমার মত স্বামী পেয়ে একদিন আমি গর্বে আত্মহারা হয়ে ছিলাম আর আজ দেখি...

বলো আরও বলো মনিরা থামলে কেনো? যত ইচ্ছা বলো শুধু তুমি কেনো সবাই আমাকে অহরহঃ জঘন্য বলে গালাগাল করে। আমি জানি এসব তারা মিথ্যা বলেনা যেমন তুমি বলছো। কিন্তু আমি কি সত্যই তোমাদের এই ঘৃণার পাত্র? মনিরা আমি নিজেই নিজেকে অভিশাপ দেই।...

মনিরা বনহুরের মুখে হাত চাপা দেয়, চুপ করো। চুপ করো!

আমাকে বলতে দাও মনিরা, কান্দাই শহরে যত মন্দ কার্জ সংগঠিত হয় সবই করি আমি। যত নর হত্যা, যত নারী হরণ সবই দস্যু বনহুরের কাজ মনিরা সবাই বলে আমি তা গ্রাহ্য করিনা কিন্তু তুমি যখন আমাকে অবিশ্বাস করো তখন আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি, আমি জানি সবাই আমাকে হীন জঘন্য বললেও কিছু এসে যাবে না শুধু তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করো মনিরা।

তুমি কি বলতে চাও খান বাহাদুর আমির আলী ও তার কন্যা নীলাকে হরণ করোনি?

করেছি কিন্তু পাপ মনোবৃত্তি নিয়ে নয় প্রয়োজনে। অবসর সময়ে সব বলবো তোমাকে।

তুমি খান বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে তার মাথা নিয়ে গেছে কেনো?

এমন হৃদয়হীন আমি নই মনিরা। তুমি তো জানো তোমার স্বামী কোন দিন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেনা।

গতরাতের হত্যালীলা তুমি করোনি?

না।

তবে কে করেছে?

জানি না।

মিথ্যা কথা।

বিশ্বাস করো আমি হত্যালীলা সম্পর্কে কিছু জানি না।

মনিরা অবাক চোখে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে।

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে মনিরা। অনেক সময় নিজের উপর বড় ধিক্কার আসে, ভাবি আত্মহত্যা করে নিজের অভিশপ্ত জীবন শেষ করে দেবো

কিন্তু পারি না—শত শত অসহায় করুণ মুখ ভেসে উঠে চোখের সামনে। হাজার হাজার দুঃখী মানুষের করুণ কান্নার সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই কানের কাছে। লক্ষ লক্ষ মা বোনের চোখের পানি আমার মনকে অস্থির করে তোলে। মনিরা আমি পারিনা মরতে.....

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলে—তোমাকে মরতে দিলে তো তুমি মরবে। কান্দাই এর কোটি কোটি মানুষ তোমাকে ধরে রাখবে। তুমি যে সবার নয়নের মনি...একটু থেমে বলে মনিরা—চলো হাত মুখ ধোবে চলো। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি।

না মনিরা বেশিক্ষণ আমি থাকতে পারবো না। যতক্ষণ থাকি ছাড়বোনা তোমাকে।

তবে নূরকে কথা দিলে কেনো?

নূরের সঙ্গে মাঠে খেলা দেখতে যাবো আর ফিরে আসবো না—কারণ বহু কাজ আছে মনিরা।

তা হবে না—শুধু তোমার কাজ আর কাজ।

মা কোথায়?

মা বাসায় নেই ফিরোজাদের বাসায় গেছে।

ফিরোজা?

তুমি চিনবে না, মামীমার বোনের মেয়ে। অনেক দিন যাননি কিনা তাই গেছেন ওদের বাড়ি।

ও!

লক্ষ্মীটি তুমি বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসো, আমি চট করে তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসি!

আচ্ছা যাও বেশি কিন্তু দেরী করো না।

করবো না, করবো না এক্ষুণি আসবো।

মনিরা চলে যায়।

রান্না ঘরে বাবুর্চী তখন পাকশাক নিয়ে ব্যস্ত আছে। মনিরা স্বামীর জন্য নিজের হাতে কিছুটা খাবার তৈরি করে নিয়ে বেরিয়ে আসে।

সিড়ির মুখে আসতেই চমকে উঠে মনিরা তিনজন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার ভিতরে প্রবেশ করছে তাদের সঙ্গে রয়েছে বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মনিরার কানে গেলো সরকার সাহেবের গলা—সত্যি বলছি আমি জানি না....

পুলিশ ইন্সপেক্টরের গলা—আমাদের গোয়েন্দা পুলিশ নিজেরা চোখে দেখেছেন একটি ভদ্রলোক আপনাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছেন আমরা সন্দেহ করছি তিনি স্বয়ং দস্যু বনহুর—

মনিরা আর মুহূর্ত দাঁড়ায় না সে খাবারের ট্রে হাতে চলে যায় নিজের ঘরে যেখানে সে একটু পূর্বে তার প্রিয়তমকে রেখে গেছে।

কিন্তু ঘরে প্রবেশ করে অবাক হয় শূন্য ঘরখানা খাঁ খাঁ করছে। মনিরা খাবারের ট্রে টেবিলে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বাথ রুমে ধাক্কা দেয়। দরজা খোলা ভিতরে কেউ নেই।

হঠাৎ মনিরার নজরে পড়ে বালিশের উপরে ছোট্ট এক টুকরা কাগজ। মনিরা দ্রুত হাতে কাগজের টুকরাখানা তুলে নেয় হাতে ওতে লেখা আছে—

"প্রিয়া, কিছু বলবো বলে এসেছিলাম কিন্তু
হলো না। তোমার হাতের খাবারও খাওয়া
ভাগ্যে নেই। চলে যাচ্ছি...
তোমার মনির

মনিরার চোখ দিয়ে গড়িয়ে গড়ে দু'ফোটা অশ্রু। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার বাইরে পুলিশ অফিসারদের গলা শোনা যায়।

মনিরা চট করে আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছে নেয়।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে বৃদ্ধ সরকার সাহেব—মা মনি পুলিশ অফিসারগণ এসেছেন এ ঘরে আসবেন।

মনিরা বললো—আসতে বলুন।

সরকার সাহেব তিনজন পুলিশ অফিসারসহ ভিতরে প্রবেশ করে।

মনিরা চিঠির টুকরাখানা ব্লাউজের ফাঁকে রেখে এক পাশে সরে দাঁড়ায়।

পুলিশ অফিসারত্রয় সমস্ত ঘরখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকেন।

বাড়ির বাইরে অসংখ্য পুলিশ ফোর্স ঘিরে আছে। পুলিশ অফিসারত্রয় সমস্ত বাড়িখানায় তল্লাসী চালিয়ে কোথাও বনহুরকে খুঁজে পায় না।

এদিকে পুলিশ অফিসারগণ যখন অন্তপুরে দস্যু বনহুরের সন্ধান করে চলেছে তখন বনহুর পিছন পাইপ বেয়ে বাগানে প্রবেশ করে একটা হাস্নু হানার ঝোপের পাশে আত্মগোপন করে সব লক্ষ্য করে সে।

অদূরে পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে ড্রাইভার বসে বসে ঝিমুচ্ছে। হয়তো বেচারী সমস্ত রাত ঘুমায়নি।"

বনহুর ভালভাবে তাকিয়ে দেখলো গাড়িখানার আশে পাশে কেউ নেই। গাড়ি বারেন্দায় তার গাড়িখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদূরে গ্যারেজ সেদিকেও কেউ নেই।

বনহুর অতি সন্তর্পণে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়ায় তারপর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ড্রাইভারের মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে টেনে নামিয়ে নেয়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়—না এদিকে কেউ নেই। কারণ এটা বাইরের দিক, বাড়িটাকে শুধু পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে বাইরের দিকে নয়।

বনহুর ড্রাইভারকে তুলে নিয়ে গ্যারেজে প্রবেশ করে। দ্রুত হস্তে খুলে নেয় ওর পোশাক পরিচ্ছদ। পরে নেয় সে তারপর মাথার ক্যাপ তুলে দেয়। ফিরে আসে গাড়ির পাশে।

ততক্ষণে পুলিশ অফিসারত্রয় গাড়িখানার দিকে এগিয়ে আসেন।

বাড়ির পিছন দিকে যে সব পুলিশ পাহারা দিচ্ছিলো তারাও তাদের নিজ নিজ পুলিশ ভ্যানে চেপে বসে।

বনহুর গাড়ি ছাড়লো।

পুলিশ সুপার বললেন—মিঃ জাফরীর অফিসে চলো।

ড্রাইভ আসনে বনহুর মাথা কাৎ করে বললো—আচ্ছা স্যার।

গাড়িতে বসে পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্নতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চললো।

পুলিশ সুপার আরিফ হোঁসেন বললেন—এমনভাবে হয়রানি হবো ভাবতে পারিনি। মিঃ জাহেদ আপনি হয়তো ভুল দেখেছেন?

স্যার আমি মোটেই ভুল দেখিনি। দেখেছি একটি যুবক গাড়ি থেকে নেমে চৌধুরী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো। নিশ্চয়ই সে দস্যু বনহুর কারণ যুবকটির চেহারা অত্যাধিক সুন্দর এবং বলিষ্ঠ।

হাসলেন পুলিশ সুপার—আপনার সন্দেহ সত্য নয় মিঃ জাহেদ। সমস্ত বাড়িখানা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো তবু সেই যুবকটিকে পাওয়া গেলোনা তবে গেলো কোথায়?

স্যার আমিও তাই ভাবছি সে গেলো কোথায়?

অপর অফিসার এতোক্ষণ নীরব ছিলেন তিনি বললেন—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করেন কিন্তু তত সহজ নয়! মিঃ জাফরীর মত মানুষ হীমসীম খেয়ে গেছেন তবু তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি!

মিঃ জাহেদ বললেন—বিস্ময়কর দস্যু এই বনহুর। স্যার আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি সে কি তবে হাওয়ায় মিশে গেলো।

বললেন ইন্সপেক্টার মিঃ মোহসিন—আপনার চোখের ভ্রমও তো হতে পারে!

মোটেই চোখের ভ্রম নয় মিঃ মোহসিন। আমি নিজের চোখকে কোন সময় অস্বীকার করতে পারিনা। নিশ্চয়ই কোন গোপন স্থানে সে লুকিয়ে পড়েছে সেখানে আমরা তাকে খুঁজে পাবোনা!

একটু হেসে গম্ভীর গলায় বললেন পুলিশ সুপার—যদি সে ঐ বাড়ির মধ্যেই আত্মগোপন করে থাকে তবে নিশ্চয়ই সে এক সময় বাহিরে বের হবে এবং পালাতে চেষ্টা করবে। আমাদের ডি আই বি পুলিশ ঐ বাড়ির চারিদিকে গোপনে ছড়িয়ে আছে।

ড্রাইভ আসনে বসে বনহুর সব শুনতে পাচ্ছিলো একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার মুখে।

মিঃ জাফরীর অফিসে গাড়ি পৌঁছতেই পুলিশ অফিসারত্রয় নেমে পড়লেন।

ড্রাইভ আসন থেকে নামলো দস্যু বনহুর। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ইংরেজিতে কিছু লিখে কাগজখানা গাড়ির গায়ে রেখে তারপর একটি পুলিশ এর হাতে সেটা দিয়ে বললো—যারা এই মুহূর্তে এলেন তাদের যে কোন সাহেবকে দিও।

পুলিশ হেসে বললো—ছুটি নেবে বুঝি?

হাঁ ভাই।

পুলিশ চিঠিখানা হাতে নিয়ে মিঃ জাফরীর অফিসের দিকে চলে গেলো।

সেই ফাঁকে দস্যু বনহুর অফিস গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি গাড়ি যাচ্ছিলো।

বনহুর হাত তোলে!

গাড়িখানা থেমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

বনহুর গাড়িতে চেপে বসে বলে—ক্লার্ক রোড ১৩নং এ চলো।

ড্রাইভার বলে—আচ্ছা স্যার।

অবশ্য বনহুরের শরীরে তখন পুলিশের পোশাক ছিলো তাই গাড়ির ড্রাইভার অতি সম্মানের সঙ্গে কথা বললো।

পুলিশটা অফিসে প্রবেশ করে ড্রাইভারের দেওয়া চিঠিখানা পুলিশ সুপারের হাতে দেয় স্যার এটা আপনার গাড়ির ড্রাইভার দিলো।

পুলিশ সুপার চিঠিখানা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন চিঠিতে লিখা রয়েছে—"অনেক ধন্যবাদ—আমাকে গ্রেপ্তার
করতে গিয়ে অনেক হয়রানি হয়েছেন
সে জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আমিই
আপনাদের পৌছে দিয়ে গেলাম।"
—দস্যু বনহুর

পুলিশ সুপার চিৎকার করে উঠলেন—দস্যু বনহুর! শীঘ্র যাও, গ্রেপ্তার করো, আমাদের গাড়ি যে চালিয়ে নিয়ে এসেছে সে দস্যু বনহুর।

মিঃ জাফরী পর্যন্ত শোফা ত্যাগ করে লাফিয়ে উঠলেন—দস্যু বনহুর! কোথায়, কোথায় সে?

ততক্ষণে পুলিশ সুপার নিজেই ছুটলেন।

তাঁর পিছনে অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন—কই ড্রাইভার, সে কোথায়?

যে পুলিশ চিঠিখানা নিয়ে গিয়েছিলো সে ভয় কম্পিত কণ্ঠে বলে—হুজুর ড্রাইভার আমার হাতে চিঠি দিয়ে এখানে ছিলো কিন্তু সে গেলো কোথায়?

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য অফিসারগণ সবাই এসে দাঁড়াল সেখানে।

মিঃ জাফরী বললেন—যত সহজ মনে করছেন তত সহজ নয় মিঃ আহম্মদ। এবার হেসে বললেন—যাকে গ্রেপ্তার করতে গেলেন সেই কিনা আপনাদের গাড়ি চালিয়ে এলো অথচ আপনারা কেউ একটুও টের পেলেন না। সত্যি সে একটি বিস্ময়। মিঃ আহাম্মদ, আমি যতই এই দস্যুটা সম্বন্ধে গবেষণা করছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি।

কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ছি।

পুলিশ সুপার বলে উঠেন—নিশ্চয়ই সে আশে পাশে কোথাও আছে। তোমরা অনুসন্ধান চালাও.......যাও....

কোন ফল হবেনা মিঃ আহম্মদ। চলুন ভিতরে গিয়ে বসা যাক।

পুলিশ সুপার মিঃ আহাম্মদ এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন মিঃ জাফরীর মুখের দিকে।

❑

সর্দার।

কে?

রহমান।

কখন এলে?

এই মাত্র আসছি

কি সংবাদ?

কান্দাই পর্বতমালার কিছু অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোন রকম বৃক্ষাদি বা জীব জন্তুর চিহ্ন নাই।

বনহুর সম্মুখের রেকাবী থেকে এক থোকা আংগুর তুলে নিয়ে মুখে ফেলে চিবুতে চিবুতে বললো—হুঁ।

রহমান বলে চললো—সর্দার সেদিন যে শব্দ হয়েছিলো তা সমস্ত কান্দাই শহরকে প্রকম্পিত করে তুলেছিলো। কান্দাইবাসীগণ মনে করেছিলো নিশ্চয়ই কান্দাই পর্বতে অগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটলো। সর্দার আমাদের আস্তানা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিলো। এতো বড় শব্দের কারণ আজ আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। বড় আশ্চর্য.... একটু থেমে বললো আবার রহমান—সর্দার হামবার্ট কি তার সমস্ত ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেলেছে?

সমস্ত ঘাটি ধ্বংস করে না ফেললেও তার আসল জঙ্গল বাড়ি ঘাটি সে বিনষ্ট করে ফেলেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে কান্দাই পর্বত মালার তলদেশে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে হামবার্ট নিশ্চিন্ত মনে আত্মগোপন করে তার কাজ সমাধা করে চলেছে। রহমান গতরাত্রে হামবার্ট এর লোক এক নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তারা মনে করেছে সেই যুবকটিই রংলাল।

সর্দার!

হাঁ রহমান। আমি জানতাম হামবার্ট রংলালকে হত্যার চেষ্টা করবে এবং করলেও তাই।

সর্দার কে সে যুবক ছিলো?

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র হাসিম কায়েসী তার নাম। ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষা লাভ করে সবে মাত্র দেশে ফিরে এসেছিলো। অনেক আশা নিয়ে সে এসেছিলো কান্দাই শহরে চাচার কন্যা মিস নীলাকে

বিয়ে করে চাচার ঐশ্বর্য ভোগ দখল করবে। কিন্তু বেচারী ....মার পড়লে হাঁ শোন রহমান নীলা কি এখন ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া করছে?

না সর্দার।

বনহুর বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো চট করে সোজা হয়ে বসে বললো—এখনও সে খায়নি?

আলী হোসেন তাই বলেছে কাল রাতেও কিছু মুখে দেয়নি আজ সমস্ত দিন নাকি খায়নি.....

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠে বনহুরের।

রহমান বলে—সর্দার নীলাকে ওখানে রাখাটা সমস্যা হয়ে পড়েছে আমার মনে হয় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ।

তুমি কিছু বোঝনা রহমান। নীলা এবং আমির আলীকে তাদের বাসভবন থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে হলো হামবার্টের হাত থেকে আপাতত তাদের রক্ষা করা। কারণ হামবার্ট আমির আলীকে হত্যা করে নীলাকে আত্মসাৎ করবে। আমি চাইনা একটা নিষ্পাপ তরুণী এভাবে নির্যাতীতা হয়।

কিন্তু না খেয়ে সে কতদিন বাঁচবে তাই ভাবছি সর্দার।

হু-সেটাই চিন্তার কথা।

রহমান বললো—সর্দার আমার মনে হয় তাকে অন্য কোথাও নিয়ে গেলে হয়তো তার মনের পরিবর্তন আসতো?

বনহুর পুনরায় রেকাবী থেকে এক থোকা আংগুর তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললো—যতক্ষণ আমি শয়তান হামবার্টকে সায়েস্তা করতে না পারবো ততক্ষণ আমির আলী ও তার কন্যা নীলাকে আমাদের দায়িত্বে সাবধানে রাখতে হবে এজন্য প্রচুর সময়ের দরকার হবে। রহমান একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না তুমি আমার শুধু সহকর্মী নও তুমি আমার বন্ধু। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

রহমান বিস্ময় নিয়ে তাকালো তার মুখের দিকে।

বনহুর মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো।

রহমানও এলো তার পাশে!

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। তারপর কয়েক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—রহমান নীলা ভালবাসতো রংলালকে। শুধু ভালবাসাই নয় রংলালকে পাবার জন্য সে সদা সর্বদা উন্মুখ। আমি বুঝতে পারছি রংলালকে না দেখে সে

কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছেনা এবং সেই কারণে খাওয়া বন্ধ করে ফেলেছে।

সর্দার!

হাঁ এখন বলো কি করে ওকে রংলালের মোহ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়।

সর্দার আপনি বলার অনেক পূর্বেই আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম নীলা শুধু রংলালকে ভালই বাসেনি তার জন্য সে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে এখন তাকে ফেরানো মুস্কিল হবে।

তুমি একটা পরামর্শ দাও রহমান?

সর্দার আমি পরামর্শ দেবো আপনাকে কি যে বলেন।

আমি ভেবে পাচ্ছিনা কি করবো। কান্দাই হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে এমন একটা সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বো ভাবতে পারিনি। একটু থেমে পুনরায় বললো বনহুর—এমন সমস্যা আমার জীবনে বহুবার এসেছে কিন্তু এমন রহস্যময় হয়ে উঠেনি।

সর্দার এক কাজ করলে কেমন হয়? যদি রংলালের হত্যা সংবাদ তাকে দেওয়া যায়। হয়তো দু'একদিন এ ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করবে তারপর....

ঠিক বলেছো রহমান তাই হোক। নীলার জীবন থেকে রংলাল মরে যাক সেই ভাল। হাঁ এই সংবাদ নীলাকে জানাও গত রাতে হামবার্টের অনুচর গোপনে আমির আলী সাহেবের বাসভবনে প্রবেশ করে রংলালকে তার শয়ন কক্ষে হত্যা করে তার মাথাটা কেটে নিয়ে গেছে।

রহমান বললো—আচ্ছা সর্দার তাই বলবো।

রহমান কুর্নিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর পায়চারী করে চলে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায়—কি হয়েছে তোমার বলো তো? সব সময় কি এতো ভাব?

বনহুর এবার তার শয্যায় বসে বালিশে ঠেশ দেয়!

নূরী বসে তার পাশে দক্ষিণ হস্তে বনহুরের জামার বোতামটা লাগিয়ে দিতে দিতে বলে—হত্যা রহস্য উদঘাটন করে খুনীকে বন্দী করেছো। এখন পুলিশের কারাগারে। তবু তোমার ভাবনা শেষ হলোনা। এতোদিন ধরে কোথায় ছিলে তাও বললে না?

বনহুর একটু হেসে বললো—হত্যা রহস্য শেষ হয়েছে কিন্তু হত্যা রহস্যের মূল উৎস যেখান থেকে সেই স্থানের সন্ধান এখনও আমি পাইনি। তবে আমার আশা আছে অল্পদিনেই আমি এর সন্ধান পাবো।

এ সব কারণে আমাকে বেশি সময় আস্তানার বাইরে কাটাতে হচ্ছে।

কিন্তু কত দিন আর চলবে তোমার এই হত্যা রহস্য উদঘাটন পালা?

যতদিন না এর মূল স্তম্ভ ভেংগে চুরমার করে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। জানো নূরী এই হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে আমি নিজেই একটা রহস্য জালে জড়িয়ে পড়েছি।

রহস্য জালে জড়িয়ে পড়েছো?

হাঁ নূরী।

সে কেমন?

বলছি শোন অবশ্য তোমার কাছে গল্পের মত মনে হবে। এক খান বাহাদূর সাহেবকে এ হত্যার রহস্যের ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় আমি তাঁর বাগানের মালি হিসাবে কাজ বেছে নিলাম। তখনও জানতাম না খান বাহাদূরটির এক তরুণী কন্যা আছে। জানলে অবশ্য অন্য উপায় অবলম্বন করতাম। বাগানে কাজ করছি হঠাৎ এক নারীকণ্ঠের আহ্বান, মালী কয়েকটা ফুল দাও তো ফিরে তাকাতেই এক জোড়া চোখ আমার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করলো। চটকরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলাম না কারণ তরুণীর চোখ দুটো তখনও আমার মুখে স্থির হয়ে আছে।

তারপর?

তারপর আমি কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তার হাতে দিলাম। আমি থনই বুঝতে পারলাম; যে ভয় আমার মনে ছিলো তাই হলো। বড় রাগ হলো নিজের চেহারাটার জন্য। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি আর কাজ করছি আবার ডাক এলো, মালী এদিকে শোন।

চমৎকার তো?

চমৎকার না ছাই।

তরুণীই বুঝি ডাক দিলো।

তাছাড়া কার এমন গরজ যে মালিকে ডাকবে। ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই তরুণী ডাক বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন। আমি হাতের কাজ রেখে উঠে দাঁড়ালাম। তরুণী ডাকলো—এদিকে এস।

তুমি এগিয়ে গেলে?

না গিয়ে উপায় ছিলোনা।

তারপর।

আমি গিয়ে দাঁড়াতেই দুটি সহানুভূতি ভরা দৃষ্টি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। তরুণী আমার নাম, বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে কে আছে, কত টাকা এখানে মাইনে পাই.....

বুঝলাম এতোদিন সেখানেই তবে কাটালে?

কথার শেষ শুনলেনা নূরী?

না আর শুনতে আমি চাইনা তুমি আর রহমান যখন কথাবার্তা বলছিলে তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সবকিছু শুনেছি।

তা হলে তো সব শুনেছো নূরী। এবার বলো কি করবো? মেয়েটি তার রংলালকে ছাড়া......

কিছুতেই বাঁচবেনা এইতো? বনহুরের কথার মাঝখানে নূরী বলে উঠলো।

কতকটা তাই।

আর স্বয়ং দস্যু বনহুর? তার মনে কি মেয়েটি রেখাপাত করেনি? যার সঙ্গে এতো......

নূরী এত নরম মন দস্যু বনহুরের নয় যে সহজেই দাগ পড়বে। তবে সহানুভূতি আছে ওর প্রতি আমার। আমি চাই সে সুস্থ মনে স্বাভাবিকভাবে রংলালকে ভুলে যায়।

বনহুর তুমি পুরুষ মানুষ তাই এ কথা বলতে বা ভাবতে পারো। নীলা যে রংলালকে ভালবেসেছে তাকে সে অন্তর দিয়েই মনে প্রাণে কামনা করে এসেছে। হঠাৎ যদি তাকে সে হারায় এর চেয়ে ব্যথা নারীর জীবনে আর কিছু নেই।

নূরী তুমি দেখছি সুন্দর কথা বলতে শিখেছো। তুমিই বলে দাও কিভাবে নীলাকে রংলালের চিন্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়?

তুমিই তো বলে দিলে রংলাল মরে গেছে বলতে কিন্তু.....

না না আর কিন্তু নয় নীলার জীবন থেকে রংলাল মরে গেছে এটাই আমি চাই। বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করে।

এমন সময় জাভেদ ছুটে আসে সেখানে—আম্মু আম্মু দেখবে এসো একটা বাঘের বাচ্চা শিকার করেছি। বাপু তুমিও আছো বেশ মজা হবে দেখবে চলো।

বনহুর জাভেদকে তুলে নেয় কোলে, গালে চুমু দিয়ে বলে—চলো কোথায় তোমার শিকার?

বনহুর আর নূরী জাভেদের সঙ্গে বেরিয়ে আসে বাইরে।

বনহুরের একজন অনুচর পাহারা দিচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটা ছোট বাচ্চা বাঘ পড়ে আছে কাৎ হয়ে। এখনও তার পেটে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে।

জাভেদ বললো—বাপু আমি এই বাঘটা মেরেছি।

সাবাস! চমৎকার তো? বড় হয়ে আরও বড় বড় বাঘ মারবে কেমন?

নূরী বলে উঠে—বাপের মতই ছেলে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি আছে।

জাভেদ বাঘের বাচ্চাটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যায়।

বনহুর বলে—নূরী চলো ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসি। আজ পূর্ণিমা?

চলো।

নূরী আর বনহুর পাশাপাশি এগিয়ে চলে।

অরণ্যের রাজা দস্যু বনহুর।

আর রানী নূরী।

দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে ওরা।

অদূরে ঝর্ণা ধারা কলকল করে বয়ে চলেছে।

ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়ায় ওরা দু'জনা।

বনহুর আর নূরী।

পূর্বাকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিচ্ছে।

বনহুর বললো—বসো।

নূরী বসে বনহুরের হাত ধরে বসিয়ে দিলো নিজের পাশে।

বনহুর বলে—অপূর্ব।

কি?

ঐ চাঁদ। নূরী। কতদিন এমনি করে ঝর্ণার পাশে তুমি আর আমি বসিনি। খুব ভাল লাগছে আমার।

সত্যি!

হাঁ নূরী।

দস্যু সম্রাট দেখছি আজ নতুন রূপ নিয়েছে।

হাঁ এই মুহূর্তে আমি দস্যু নই....

তবে কি?

তোমার প্রিয়তম।

নূরী বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

জোছনার আলোতে বনহুর নূরীর চোখ দুটোর দিকে তাকায় গভীর আবেগে।

ঐ মুহূর্তে একটা জাল এসে তার চারদিক ঘিরে ফেলে। বনহুর নূরীকে দ্রুত হাতে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ততক্ষণে তার চার পাশে জালের বেষ্টনী তাকে জড়িয়ে ফেলেছে।

নূরী চিৎকার করে উঠলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো কয়েকজন লোক তাকে লক্ষ্য করে বিরাট একটা জাল ছুড়ে মেরেছিলো, লোকগুলো এবার তাকে ধরবার জন্য চারপাশ থেকে এগিয়ে আসে।

জোছনার আলোতে লোকগুলোকে বনহুর চিনতে পারলো। এরা পুলিশ ফোর্স। প্রত্যেকের সঙ্গেই অস্ত্র রয়েছে।

একজন বললো—জীবন্ত গ্রেপ্তার করো।

বনহুর ফিরে তাকাতেই দেখলো খাকি পোশাক পরা মিঃ জাফরী তাঁর হাতে মেশিন গান।

দু'জন পুলিশ নূরীকে ধরতে যাচ্ছিলো।

মিঃ জাফরী বললেন—ওকে ছেড়ে দাও।

বনহুর জালের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ ফের্সা বনহুরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললো।

এ মুহূর্তে বনহুর অস্ত্র বিহীন রিক্ত।

জোছনার আলোতে বনহুর তাকালো নূরীর দিকে।

নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

পুলিশ ফোর্স বনহুরের হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিলো? তারপর ওকে নিয়ে চললো চার পাশে ঘেরাও করে!

গভীর জঙ্গল।

প্রায় মাইল কয়েক চলার পথ প্রশস্ত পথ আছে। সেই পথে মিঃ জাফরী এবং পুলিশ বাহিনীর গাড়ি অপেক্ষা করছে। শুধু এক দিনের প্রচেষ্টা নয় বেশ কিছুদিন হলো মিঃ জাফরী কান্দাই জঙ্গলে দস্যু বনহুরের সন্ধানে আত্মগোপন করে ঘোরা ফেরা করছে।

মিঃ জাফরী জানতেন এই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও আছে তার আস্তানা। একদিন তার এ প্রচেষ্টা সফল হবে এও জানতেন তিনি।

কান্দাই জঙ্গল ছাড়াও কান্দাই শহরের চৌধুরী বাড়ির আশে পাশেও গোপনে গোয়েন্দা পুলিশ লুকিয়ে থাকতো। যে কোন সময় দস্যু বনহুর আসতে পারে। সেদিনের অপমানের পর মিঃ জাফরী শপথ নিয়েছিলেন কান্দাই জঙ্গলে আত্মগোপন করে তবু দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবেন।

হিংস্র জীব জন্তু ভয়কে তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন মন থেকে। তার পুলিশ বাহিনীকেও তিনি এ ব্যাপারে হুশিয়ার হয়ে কাজ করতে বলেছিলেন।

এতো সহজে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবেন ভাবতে পারেনি মিঃ জাফরী।

চলতে চলতে বললেন মিঃ জাফরী—বনহুর!

বলুন মিঃ জাফরী?

মেয়েটি কে?

আমার স্ত্রী।

তোমার স্ত্রী?

হাঁ।

আমরা জানি চৌধুরী কন্যা মনিরা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তোমার তাহলে....

নূরীও আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

আর খান বাহাদুর আমির আলীর কন্যা মিস নীলাও তোমার স্ত্রী?

মিঃ জাফরী আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করেছেন বলে যাতা বলবেন এটা ভদ্রতা নয়। চলতে চলতে দাড়িয়ে পড়ে বনহুর।

তার চার পাশে উদ্যত মেশিন গান আর রাইফেল সজাগভাবে স্থির হয়ে আছে।

মিঃ জাফরীর হাতের মেশিন গানও বনহুরের দিকে তাক করা রয়েছে, তিনি একটু হেসে বললেন—সৌন্দর্যের মোহে নারীমন জয় করলেই তাকে স্ত্রী বলা যায়না বনহুর। আমি কেনো সবাই জানে তুমি কত নারীকে হরণ করে তাদের সতীত্ব নষ্ট করেছো....

মিঃ জাফরী!

বড্ড আঁচ লেগেছে না? কত অসহায় নারীর ইজ্জৎ তুমি লুটে নিয়েছো দস্যু.....

বনহুর নিজের শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দু'খানার দিকে তাকিয়ে নিজকে সংযত করে নিলো। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে অধর দংশন করলো বনহুর।

মিঃ জাফরী বললেন—কোন জবাব দিলে না তো?

আজ নয়, যেদিন আমার হাত দু'খানা মুক্ত থাকবে সেদিন দেবো।

হাসলেন মিঃ জাফরী।

ততক্ষণে তারা প্রায় রাস্তার কাছাকাছি এসে গেছে।

অদূরে গাড়িগুলো অপেক্ষা করছিলো।

মিঃ জাফরী এবং আরও তিনজন পুলিশ অফিসারসহ সম্মুখের গাড়িখানাতে উঠে বসে।

পুলিশ ভ্যানগুলোতে চেপে বসলো পুলিশ বাহিনী। সম্মুখের গাড়িখানাকে ঘেরাও করে এগিয়ে চললো ভ্যানগুলো।

গভীর জঙ্গল পেরিয়ে তারা মুক্ত আকাশের নিচে এসে পড়েছে। সোজা পথ ধরে গাড়িগুলো বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

সম্মুখ গাড়ির পিছন আসনে দস্যু বনহুর তার ঠিক পাশে, মিঃ জাফরী ও আরও তিনজন পুলিশ অফিসার।

সবাই সজাগভাবে অস্ত্র বাগিয়ে বসে আছে।

গাড়িখানার দু'পাশে দু'খানা পুলিশ ভ্যান। যাতে বনহুর গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালাতে না পারে। পিছনে আরও দু'খানা গাড়ি সর্তকতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

এখানে যখন বনহুরকে নিয়ে পুলিশ বাহিনী কান্দাই শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন কান্দাই আস্তানায় নূরী ছুটে গিয়ে রহমানকে বলে—রহমান সর্বনাশ হয়েছে!

রহমান তখন তার কন্যা ফুল্লরাকে আদর করছিলো। চমকে উঠে বলে সে—কি হলো?

বনহুরকে ধরে নিয়ে গেছে?

সর্দারকে ধরে নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ একদল পুলিশ ফোর্স গাছের আড়ালে ঝোপে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলো তারা তাকে জাল দিয়ে ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করেছে—

রহমান তাড়াতাড়ি ফুল্লরাকে নাসরিনের কোলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

নূরী পথরোধ করে দাঁড়ায়—থামো রহমান, তুমি পারবেনা তাকে ফিরিয়ে আনতে। অসংখ্য পুলিশ ফোর্স রয়েছে তাদের হাতে আছে মেশিনগান, রাইফেল? আমি নিজের চোখে দেখেছি এসব অস্ত্র।

ব্যস্ত কণ্ঠে বলে রহমান—নূরী পথ ছাড়ো। আমি এই মুহূর্তে আস্তানায় বিপদ সংকেত ধ্বনি করবো। সবাই মিলে আক্রমণ চালাবো পুলিশ বাহিনীর উপর। অস্ত্র আমাদেরও আছে—

নূরী ব্যাকুল গলায় বলে উঠে—নানা তুমি জানোনা রহমান তোমরা যদি পুলিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাও তাহলে ওরা বনহুরকে জীবিত রাখবেনা। যখন দেখবে ওরা পারছেনা তখন ওকে ওরা হত্যা করে ফেলবে। আমি জানি ওকে জীবিত রাখতে পারেনা।

তা হলে কি করবো?

আমিও বলতে পারছিনা রহমান এখন আমাদের কর্তব্য কি?

নাসরিনের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

শিশু ফুল্লরা তখন কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

নূরী বলে—রহমান অপেক্ষা করো। আমার মন বলছে তাকে ওরা ধরে রাখতে পারবেনা।

পুলিশ ভ্যানগুলো স্পীডে এগিয়ে চলেছে।

কারো মুখে কোন কথা নাই।

মিঃ জাফরী ভাবছে দস্যু বনহুরকে এমন সহজভাবে গ্রেপ্তার করা যাবে তা তিনি কল্পনা করেন নি। তিন লক্ষ টাকার মোহ তার তেমন নেই দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার আনন্দটাই তার অনেক বড়।

অবশ্য তার সঙ্গী অফিসারগণ তিন লক্ষ টাকার চিন্তাই করছিলেন। কত করে করে ভাগে আসবে এর হিসাব করছিলেন তারা মনে মনে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে গাড়িগুলো কান্দাই নদীর ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছে বিরাট ব্রিজ প্রায় দু'মাইল নিয়ে এ ব্রিজটা।

নীচে প্রখর স্রোত ধারা বয়ে যাচ্ছে।

আচমকা বনহুর ড্রাইভারের মাথায় তার শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দিয়ে আঘাত করতেই গাড়ি ব্রিজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে যায়। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়ে খরস্রোতা নদীর বুকে।

ড্রাইভার হ্যাণ্ডেলের উপর ঢলে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জাফরী এবং তার সঙ্গী পুলিশ অফিসারদের রাইফেল মেশিন গান গর্জে উঠে।

এতোদ্রুত এই কাণ্ড ঘটে যায় যে কেউ কোন কিছু উপলদ্ধি করতে পারেনা।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশ অফিসার এর গাড়ি থেকে পালিয়ে নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভ্যানগুলি থেমে পড়েছিলো। পুলিশ ফোর্স নেমে পড়লো সবাই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারপর তারা এলোপাথারী গুলি ছুড়তে শুরু করলো।

এমনভাবে মিঃ জাফরী পরাজিত হবেন ভাবতে পারেননি। তার ইচ্ছা হলো ম্যাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদেন। নিজের হাত নিজে কামড়াতে লাগলেন। কারণ এর আগেও বনহুর কয়েকবার পুলিশ ফোর্সের বুহ্য ভেদ করে সামলাতে সক্ষম হয়েছে। অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও বনহুরকে গ্রেপ্তার করে তারা কারাগার পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়নি।

রাগে দুঃখে মিঃ জাফরী মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে থাকেন।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার এবং পুলিশ বাহিনী যেন হাবাগোবা বনে যায়।

মিঃ জাফরীর আদেশে প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে অবিরাম নদী বক্ষে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ চললো।

তারপর এক সময় বিফল মনে ফিরে চললেন—মিঃ জাফরী তারদল বল নিয়ে।

গাড়িতে বসে বললেন মিঃ জাফরী আমাদের হাত থেকে পালাতে সক্ষম হলেও নদী বক্ষের প্রখর স্রোতধারা থেকে দস্যু রক্ষা পাবে না। মৃত্যু তার সুনিশ্চিত কারণ তার হাত দু'খানাই শুধু শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলোনা। কোমরেও মোটা শিকল আটকানো রয়েছে।

বনহুর যখন সংজ্ঞালাভ করলো তখন সে দেখতে পেলো একটি নৌকার মধ্যে সে শুয়ে আছে। তার পাশেই বসে আছে এক বৃদ্ধ, প্রথম নজরেই তাকে কোন মহৎ মহান ব্যক্তি বলে মনে হলো! মাথার চুল সম্পূর্ণ সাদা। মুখে কোন দাড়ি গোঁফ নেই। চোখে পুরু কাঁচের চশমা আরও দু'জনকে দেখতে পেলো বনহুর। তারা নৌকার মাঝি হবে বলে ধারণা হলো।

বনহুরকে চোখ মেলতে দেখেই বৃদ্ধ বলে উঠলেন—এখন কেমন বোধ করছো বাবা?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে তাকায় ফ্যাল ফ্যাল করে। তার হাত দু'খানা মুক্ত হলো কি করে। কোমরে বাঁধা সেই শিকলটাই বা গেলো কোথায়। সে

যখন ব্রিজের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো তখন তার হাতে এবং কোমরে লৌহ শিকল আটকানো ছিলো।

ওকে নীরব থাকতে দেখে বলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি—জানি কোন দস্যু তোমাকে এভাবে হাত এবং কোমর লৌহ শিকলে বেঁধে নদীতে নিক্ষেপ করেছিলো। ভাগ্যিস আমি ভোরে নৌকার ধারে বসে ওজু করতে গিয়ে তোমাকে দেখে ফেলেছিলাম। যাক্ পরে সব বলবো এখন একটু বিশ্রাম করো। বৃদ্ধ এবার নৌকার বাইরে তাকিয়ে বললেন—ওরে নসু এক গেলাস গরম কফি নিয়ে আয়।

বলতে না বলতে শব্দ ভেসে এলো—আসছি হুজুর।

বনহুর তখন উঠে বসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। তবু শুয়ে থেকেই বললো—আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি।

তবু কিছুটা বিশ্রাম নেওযা দরকার। ওরে নসু হলো, নিয়ে আয়।

আসছি—একটু পরে একটা বয় এক গেলাস কপি হাতে নৌকার ভিতরে প্রবেশ করে।

বৃদ্ধ নসুর হাত থেকে কফির গেলাসটা নিয়ে বনহুরের মুখে ধরেন খাও বাবা!

বনহুর উঠে বসতে যায়।

বৃদ্ধ ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন—না না শুয়ে শুয়েই খাও আমি তোমাকে তুলে খাওয়াচ্ছি।

বনহুরের দু'চোখ ভরে পানি এসে যায়, মনে পড়ে তার আব্বা চৌধুরী সাহেবের কথা। তিনি আজ বেঁচে থাকলে এমনি করে হয়তো দুধের গেলাস তার মুখে তুলে ধরতেন। বনহুর আপত্তি করে না বৃদ্ধার হাত থেকে কফি খেতে থাকে।

অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও কিছু সময় বনহুর চুপ চাপ শুয়ে রইলো।

বৃদ্ধ তার ছোট্ট একটা বাক্স বের করে কিছু ঔষধ খেতে দিলো। এটা খেলে সব ক্লান্তি অবসান দূর হবে।

বনহুর খেলো।

এবার কিন্তু সে উঠে বসলো নৌকার মধ্যে!

নৌকাখানা তখনও দুলে দুলে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে জানালো। হঠাৎ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করবে তাও বিবেকে বাঁধে। অনেকগুলো প্রশ্ন তার মনে তোল পাড় শুরু করে দিয়েছে।

বনহুর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে বললো — তোমাদের নৌকায় ডাকাত পড়েছিলো বুঝি?

বনহুর ঢোক গিয়ে বলে হাঁ।

সব ছিনিয়ে নিয়ে তোমাকে হাত কোমর বেঁধে পানিতে ফেলে ছিলো মনে হচ্ছে?

হাঁ আমার ঠিক সব কথা মনে নেই কারণ আমি তখন ঘুমিয়েছিলাম কিনা।

ও এবার বুঝতে পারছি। তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে?

আমরা মানে আমি একাই ছিলাম নৌকায়। আমার যতদূর মনে হয় নৌকার মাঝিরাই আমাকে নদী বক্ষে ফেলে দিয়েছে তবে হাঁ আমার হাত কোমর যখন ওরা বাঁধে তখন কিছু কিছু দেখেছি। আচ্ছা আমার হাত এবং কোমরের বাধন কি করে খুলে গেলো?

আমার নৌকার মাঝিদের কাছে লোহার বাটাল এবং সাড়াসী আছে। ওরাই অনেক চেষ্টা করে তোমার লৌহ শিকলগুলো খুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

এতোক্ষণে বনহুর বুঝতে পারলো তার হাত এবং কোমরের বাধন কি করে খোলা হয়েছে। বনহুর মনে মনে দয়াময়কে অশেষ ধন্যবাদ জানালো! তিনিই রক্ষা কর্তা, কতবার তাকে মৃত্যু থেকে তিনি রক্ষা করেছেন!

বনহুরকে ভাবতে দেখে বললো বৃদ্ধ—তুমি কিছু ভেবোনা বাবা। জিনিস পত্র যা গেছে তার জন্য দুঃখ নেই জীবন বেঁচে গেছে এটাই বড়।

বনহুর বললো—হাঁ ঠিক বলেছেন।

বাবা সবই ঐ খোদাতালার দয়া। কান্দাই থাকতাম দেশে যাচ্ছি। কিছু টাকা পয়সা করেছিলাম ব্যবসা বাণিজ্য করে। অবশ্য আমি কোন দিন অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিনি তবু একটা ভয়।

ভয়! কিসের ভয় আপনার?

ঐ ভয়েই তো আমি শহর ছেড়ে গ্রামে যাচ্ছি। সেখানে তবু নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো।

কিসের ভয়ে আপনি গ্রামে যাচ্ছেন তাতো বললেন না?

এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলেন বৃদ্ধ দস্যু বনহুরের....

দ-স্যু-ব-ন হু-রে-র.... ভয়ে?

হাঁ বাবা। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো কান্দাই থেকে আজকাল জীবন্ত মানুষ উধাও হয়ে যাচ্ছে। খুন খারাবীর কথাই নাই....

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ।

বৃদ্ধ বলে চলেছেন—খান বাহাদুর আমির আলী আর তার মেয়ে নীলাকে একরাতে দস্যু বনহুর হরণ করে নিয়ে গেছে। তারপর খান বাহাদুরের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র হাসিম কায়েসীকে হত্যা করে গলা কেটে মাথাটা নিয়ে গেছে। তাই আমি আর—

তাই আপনি দস্যু বনহুরের ভয়ে শহর ত্যাগ করে গ্রামে চলে যাচ্ছেন?

হাঁ বাবা কি জানি কখন দস্যু বনহুর আমার প্রতি নজর দেবে। তাই ভালয় ভালয় চলে যাচ্ছি—

একটু হেসে বললো বনহুর—দস্যু বনহুরের গতি শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ নয় গ্রাম হতে গ্রামাঞ্চলেও সে যখন তখন আবির্ভূত হতে পারে।

তাহলে আমি কোথায় যাবো বাবা? দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তুমি দেখছি সব জানো।

হাঁ কারণ আমিও তো আপনার মতই বিপদগ্রস্থ।

সত্যি! সত্যি তুমিও আমার মত বিপদগ্রস্থ মানে দস্যু বনহুরের ভয়ে—শহর ছেড়ে পালাচ্ছো বুঝি?

হাঁ। তবে এখন আর কোন ভয় নেই আমার।

সব জিনিস দস্যু লুটে নিয়েছে তোমার?

হাঁ।

বৃদ্ধ বললো—বাবা দুঃখ করোনা সব গেছে আবার হবে চলো আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলো তোমাকে আমি নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করেছি।

বৃদ্ধ বনহুরকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব আদর যত্ন করে রাখলো।

এখানে এসেও সোনা দানা কোথায় লুকিয়ে রাখবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন। বারবার তিনি বনহুরকে ডেকে বলতে লাগলেন—বাবা কোথায় এসব লুকিয়ে রাখবো বলোনা? মাটির তলায় না সিন্ধুকে কোথায় রাখবো এসব ধন সম্পদ?

বনহুর হাসলো, বললো—আপনি আমাকে এতো বিশ্বাস করছেন, আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি আপনার ধন সম্পদ নিয়ে আপনি যে ভাবে রাখতে চান রাখুন। দস্যু বনহুর আপনার কোন ক্ষতি করবেনা।

সত্যি বলছো বাবা?

হ্যাঁ। তাছাড়া আপনার ভয়ের কোন কারণও নেই। দস্যু বনহুর কোনদিন সৎ উপায়ের অর্জিত ধন সম্পদ লুটে নেয় না। আপনি নিশ্চিন্ত এ ব্যাপারে।

বনহুর কথাগুলো বলে চলে গেলো নিজের কক্ষে। এই গ্রামে আসার বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে এ কক্ষেই থাকতে দিয়েছিলেন।

দু'দিন কেটে গেলো হঠাৎ একদিন ভোরে বৃদ্ধ বনহুরের ঘরে গিয়ে দেখলেন সে নাই। গেলো কোথায় অনেক খোঁজা-খুজি করেও তার সন্ধান মিললোনা।

বৃদ্ধ প্রায় কেঁদে ফেললেন ঠিক ঔ মুহূর্তে চাকর এসে একটা ভাজ করা কাগজ তার হাতে দিয়ে বললো—ঐ যুবকটি যে ঘরে থাকতো সেই ঘরের বিছানায় বালিশের তলায় ছিলো।

বৃদ্ধ ভাঁজ করা কাগজখানা খুলে পড়তে লাগলেন, কাগজে লিখা ছিলো—

শ্রদ্ধেয়, আমার জীবন রক্ষা করেছেন এ
জন্য আমি চিরদিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ
থাকবো। বিপদ মুহূর্তে আমাকে স্মরণ
করবেন ঠিক এসে হাজির হবো!

আপনার সন্তান সম—
'দস্যু বনহুর'

বৃদ্ধের কম্পিত হাত থেকে চিঠিখানা খসে পড়ে ভূতলে। ভয় বিবর্ণ মুখে বলেন তিনি—যার ভয়ে আমি শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছিলাম সেই দস্যু বনহুরকেই আমি নৌকায় করে আমার বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম! আপন মনেই বলে চলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। প্রথমে পাংশু বর্ণ ধারণ করে তারপর ধীরে ধীরে প্রফুল্ল আনন্দ উজ্জল হয়ে উঠে তার মুখখানা, তিনি বলে উঠেন—ওরে তোরা শুনে যা, ওরে তোরা শুনে যা দস্যু বনহুর আমার ছেলের মত। আমার বাড়িতে সে এসেছিলো আমি তাকে নৌকায় করে নিয়ে এসেছিলাম....

বাড়ির সবাই এসে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। বৃদ্ধের কথা শুনে তো সবাই হতবাক, বলেন কি দস্যু বনহুর তাদের এই গ্রামে এসেছিলো। বিস্ময় ভয় আর আতঙ্ক ফুটে উঠে সকলের চোখে মুখে!

বৃদ্ধ বলে চলেছেন—দস্যু বনহুর কি লিখে গেছে শোন সে আমার কাছে কৃতজ্ঞ। যখন আমি বিপদে পড়বো তাকে স্মরণ করলেই এসে হাজির হবে। সে আমার সন্তান সম, দস্যু বনহুর আমার সন্তান হবে এ কম কথা নয়.....

এখানে যখন দস্যু বনহুরকে নিয়ে তোল পাড় চলেছে তখন বনহুর ফিরে চলেছে তার আস্তানা অভিমুখে।

প্রথমে গরুর গাড়ি তারপর রেল পরে মোটর গাড়ি।

বনহুর সমস্ত দিন বিভিন্ন যানবাহনে চলার পর এক সময় ফিরে আসে তার আস্তানায়।

নূরী বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছিলো।

রহমান তার অনুচরগণ সহ চলে গিয়েছিলো সর্দারের খোঁজে পুলিশ বাহিনী সর্দারকে কৌশলে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে আর তারা নিশ্চিন্ত বসে থাকবে এ কখনও হতে পারে না। রহমান তাদের শহরের আস্তানায় গিয়েই জানতে পারে সর্দারকে তারা রাতের বেলায় গ্রেপ্তার করে আসলেও কান্দাই জেল বা হাঙ্গেরী কারাগার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ব্রিজের উপর থেকে নদী বক্ষে লাফিয়ে পড়েছিলো বনহুর।

কথাটা শুনে রহমান খুশি হওয়ার চেয়ে চিন্তিত হয়েছিলো বেশি কারণ কান্দাই নদীর গভীরতা যেমন বেশি তেমনি প্রখর স্রোত। নূরীর মুখে শুনে ছিলো রহমান সর্দারকে জাল বেষ্টনী দ্বারা ঘেরাও করে তার হাত এবং কোমরে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করেছিলো। রহমান এ কারণেই বেশি দুচিন্তা গ্রস্থ হয়ে পড়েছিলো।

কান্দাই শহরের আস্তানায় গিয়ে রহমান দলবলসহ জেলের বেশে কান্দাই নদীর বুকে নৌকা নিয়ে সন্ধান চালিয়েছিলো। যদি সর্দার কোনক্রমে নদী বক্ষে ভেসে থাকতে সক্ষম হয়। অবশ্য বনহুরের হাত দু'খানা মুক্ত থাকলে তারা এমন চিন্তিত হতোনা।

নূরী তো কেঁদে কেটে আকুল হয়ে পড়েছিলো।

ঐ সময় হঠাৎ কে যেন তার পিঠে হাত রাখলো। পরক্ষণেই তার অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর—নূরী।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকায়—তুমি! তারপর বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠে—জানতাম কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না।

বনহুর নূরীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে বলে—জানতেই যদি কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারবে না তবে কাঁদছিলে কেনো? চোখে অশ্রু কেনো তবে বলো?

নূরী বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে—ও কিছু না। হুর কি করে তুমি পুলিশের ব্যূহভেদ করে পালিয়ে এলে?

তোমার চোখের অশ্রু আমাকে পালাতে সক্ষম করেছে নূরী।

বনহুর!

বলো?

আর আমি তোমাকে আস্তানার বাইরে নিয়ে যাবোনা।

হেসে বলে উঠে বনহুর—তুমি বড্ড অবুঝ নূরী।

না না, বার বার আমার মনে হচ্ছিলো কেনো তোমায় আমি ঝর্ণার ধারে নিয়ে গিয়েছিলাম! কেনো আমি তোমাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। হুর, যদি তুমি ফিরে না আসতে তাহলে আমি আত্মহত্যা করতাম.....

নূরী কোন সময় অমন কথা মুখে আনবেনা বা চিন্তা করবে না। তুমি তো জানো যে কোন মুহূর্তে আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে তাই বলে.....

ও কথা বলো না হুর। আমি ভাবতে পারি না তোমাকে হারানোর কথা। তুমি যে আমার জীবন....শুধু আমার নও মনিরা আপাও যে তোমাকে হারালে কেঁদে কেঁদে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বনহুর এবার এসে বলে—তোমরা চিরদিন আমাকে ধরে রাখতে পারবে? আমিও তো মানুষ। জন্মেছি মরতেও হবে আমাকে। জানো সেদিন আমি মৃত্যুর হাত থেকে অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছি। এক বৃদ্ধ আমাকে রক্ষা করেছেন...

বলবে আমাকে সব কথা?

বলবো

বনহুর সব ঘটনা বলে, নূরী বিস্ময় নিয়ে শুনে যায়।

আস্তানায় একটা নিরান্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। বনহুর ফিরে আসায় আবার আনন্দ স্রোত বয়ে চললো।

কায়েস বনহুরের শহরের আস্তানায় সংবাদটা জানিয়েছিলো।

শহরের আস্তানার অনুচরগণ এক অন্ধকারময় বিষাদ অবস্থায় প্রহর গুণছিলো তারা যখন জানতে পারলো তাদের সর্দার সুস্থ শরীরে কান্দাই আস্তানায় ফিরে এসেছে, তখন সবার মুখে হাসি ফুটলো।

লোক ছুটলো কান্দাই নদী বক্ষে নৌকা নিয়ে যেখানে আজ ক'দিন যাবৎ রহমান সর্দারের সন্ধান করে ফিরছে।

যখন রহমান হতাশ হয়ে পড়েছে। তখন কান্দাই শহরের আস্তানা থেকে লোক এলো শুভসংবাদ নিয়ে। সর্দার জীবিত আছে এবং ভাল আছে শুনে

রহমান খুশিতে আত্মহারা হয়ে ফিরে এলো প্রথমে কান্দাই শহরের আস্তানায় তারপর কান্দাই জঙ্গল আস্তানায়। রহমান এসে দাঁড়াতেই বনহুর রহমানকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

রহমানের চোখে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়লো।

প্রথমেই বনহুর জিজ্ঞাসা করলো—রহমান খান বাহাদুর ও তাঁর কন্যা নীলা কেমন আছে!

রহমান বললো—খান বাহাদুর ভালই আছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে নাওয়া খাওয়া করছেন কিন্তু....

বলো কিন্তু কি?

নীলার অবস্থা ভাল নয়।

বনহুর দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকালো রহমানের মুখে।

রহমান বললো আবার———নীলা সব সময় রোদন করছে! অনেক বলে কয়েও তাকে কিছু খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে না একটু মুখে দেয় তা যৎসামান্য।

বনহুরের মুখমণ্ডলে গভীর একটা চিন্তা রেখা ফুটে উঠে।

রহমান একটু ইতস্ততঃ করে বলে—সর্দার নীলাকে রংলালের মৃত্যু সংবাদটা.....কথা শেষ না করেই থেমে পড়ে সে।

বনহুর বলে উঠে—হাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে রহমান সংবাদটাই তাকে বেশি উদভ্রান্ত করে তুলেছে। একটু থেমে বলে —আচ্ছা যাও আমি চিন্তা করে দেখবো কি করা যায়।

রহমান কুর্নিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

নূরী বনহুরের জামার অস্তিন চেপে ধেরে—বনহুর তুমি না বললেও আমি সব শুনেছি—রহমান আমাকে সব খুলে বলেছে। একটি মেয়ের জীবন তুমি এভাবে নষ্ট করতে পারো না। আমি জেনেছি নীলা রংলালকে ছাড়া বাঁচতে পারে না! যখন সে জানতে পেরেছে রংলালকে কে বা কারা হত্যা করেছে তখন নীলা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো। তারপর থেকে নাকি সে নাওয়া খাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছে।

তুমিই বলো আমি কি করতে পারি?

ভুল তোমার প্রথমেই হয়েছে কারণ যখন নীলা মালিকে দেখে অভিভূত হয়েছিলো তখনই সরে পড়া উচিৎ ছিলো....

তুমি যা বলছো তা সম্ভব ছিলো না কারণ কান্দাই হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গেলে আমাকে আমির আলীর বাড়িতে সদা সর্বদা থাকতে হবে, বাইরে থেকে এ হত্যা রহস্যের কোনো হদিস পাওয়া যেতো না। তুমি বিশ্বাস করো নূরী আমি সেজন্যই বাধ্য হয়ে নীলার সঙ্গে অভিনয় করেছি।

তুমি কি জানতে না এর পরিণতি কি হবে?

জানতাম তবু উপায় ছিলো না।

এখন নীলাকে কি করে বাঁচাবে সেই চিন্তা করো।

নূরী আমি ভেবে পাচ্ছি না কি করবো?

শোন হুর তুমি রংলাল বেশে নীলার সঙ্গে দেখা করো।

কি করে তা সম্ভব?

আমি জানি তুমি যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারো।

নূরী তুমি কি চাও আমি নীলার সঙ্গে আবার....

তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি তাই। যখন তোমার কাজ শেষ হবে তখন আমি বলে দিব কি করবে তুমি।

নূরী!

হাঁ বনহুর।

অসাধারণ নারী তুমি। সত্যি মাঝে মাঝে আমি তোমার আচরণে অবাক না হয়ে পারি না। মনিরাও আমার স্ত্রী অথচ তোমাদের দুজনার মধ্যে কত তফাৎ। মনিরা চায় না যে তার স্বামী দ্বিতীয় কোন নারীর সংস্পর্শে আসে। আর তুমি কতদিন নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেছো হাসিমুখে।

নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে—আমি জানি তুমি পবিত্র তুমি নিষ্পাপ। কোন দিন অপবিত্রতা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাই তো আমার এতো বিশ্বাস তোমার উপর।

নূরী তোমার সে বিশ্বাস যেন অটুট থাকে।

❑

ভারী বুটের শব্দে মুখ তুলে তাকালো নীলা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ খানা ফিরিয়ে নিলো। একটা ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা ভাব তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বনহুর।

নীলা আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।

বনহুর বলে উঠে—মিস নীলা ভাবতে পারিনি আপনি জ্ঞানবতী শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে এতো অবুঝ হবেন একটা নগণ্য সাধারণ যুবকের জন্য এভাবে ভেংগে পড়বেন সত্যি আশ্চর্য।

এবার বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে উঠে নীলা—তুমি আমার যে ক্ষতি করেছো তা কোনদিন পূর্ণ হবে না। যাও তোমার কথা আমি শুনতে চাই না। জানি তুমি আমায় বশিভূত করে আমার সর্বনাশ করবে কিন্তু মনে রেখো দস্যু কোনদিন তোমার আশা পূর্ণ হবে না।

অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বলে মিস নীলা আপনি ভুল বলছেন জানেন এই মুহূর্তে আপনার সব গর্ব খর্ব করতে পারি। দস্যু বনহুরের বাসনা কোনদিন অপূর্ণ থাকে নি। কিন্তু আমি এতো সহজে আপনাকে গ্রহণ করতে চাই না। আরও সময় দিলাম ভেবে দেখুন মুক্তি চান না বন্দিনী থাকতে চান? যদি রংলালের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন তা হলে মুক্তি পাবেন আর যদি রংলালকে চান তাহলে কোনদিন আপনার মুক্তি নাই। আমার বন্দীশালায় চিরদিন আপনাকে বন্দিনী থাকতে হবে।

রংলাল! রংলাল বেঁচে আছে! বলো বলো দস্যু বনহুর রংলাল বেঁচে আছে! নীলা শয্যা ত্যাগ করে ছুটে আসে বনহুরের পাশে।

বনহুর বলে—হাঁ সে জীবিত আছে।

সত্যি। সত্যি বলছো দস্যু বনহুর!

মিথ্যা বলে লাভ নেই কোন তাই মিথ্যে বলবো না। যা বলছি সব সত্যি।

নীলা বনহুরের বুটসহ পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে—তুমি আমাকে রংলালের কাছে নিয়ে চলো।

কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কেনো, কোনো সম্ভব নয়!

যদিও রংলাল মরেনি কিন্তু সে বন্দী অবস্থায় আছে।

রংলাল বন্দী!

হ্যাঁ।

তোমার পায়ে পড়ি আমাকে একবার তুমি তার কাছে নিয়ে চলো।

যা বলবো যদি আমার কথামত চলতে পারেন তবে আমি তাকে নিয়ে আসবো আপনার কক্ষে।

যা বলবে তুমি আমি তাই করবো! তবু ওকে একবার আমায় দেখতে দাও।

আজ থেকে নিয়মমত নাওয়া খাওয়া করবেন, যান ঐ যে টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া খেয়ে নিন।

নীলা এগিয়ে যায় টেবিলের পাশে।

বনহুর একটু হেসে বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায় নীলা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতিক্ষা করতে থাকে। না জানি কখন দস্যু বনহুর তার রংলালকে নিয়ে হাজির হবে। একটা অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগছে তার হৃদয়ে। আবার পরক্ষণেই মনটা ভরে উঠছে হতাশায় দস্যু বনহুর মিথ্যা বলেনি তো।

একটা শব্দে ফিরে তাকায় নীলা; দেখতে পায় কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে রংলাল। মুহূর্তে তার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে ওর বুকে—রংলাল!

নীলা!

বলো কোথায় ছিলে তুমি?

তোমার সম্মুখেই ছিলাম—মানে আমাকে ওরা বন্দী করে রেখেছিলো এই বন্দীশালায়।

আর আমি তোমায় যেতে দেবোনা মনির। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

নীলা এটা দস্যু বনহুরের আস্তানা। এখানে আমরা সবাই তার বন্দী।

আমি দস্যু বনহুরকে বলে তোমায় ভিক্ষা চেয়ে নেবো। তুমি থাকবে আমার পাশে।

নীলা আমাকে মাত্র একটি ঘন্টার জন্য দস্যু বনহুর মুক্তি দিয়েছে। যদি তার বেশি বিলম্ব হয় তাহলে হয়তো আর আমাকে এখানে আসার অনুমতি সে দেবে না।

মনির তুমি বেঁচে আছো সুস্থ আছো এটাই যে আমার সবচেয়ে আনন্দ। দস্যু বনহুরের লোক বলেছিলো তুমি বেঁচে নাই। সত্যি আমি যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আত্মহত্যা করবো বলে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম।

নীলা এ তুমি কি বলছো?

সত্যি বলছি কিন্তু ওরা আমাকে মরতে দেয়নি। মরলে তোমাকে দেখতে পেতাম না রংলাল।

বনহুর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলা বনহুরের বুকে মুখ রেখে গভীর আবেগে বলে চলে—জানিনা তুমি কি! জানিনা তুমি কি রংলাল। তোমাকে আমার এতো ভাল লাগে কেনো। আমি জানিনা....

নীলা আজকে বিদায় দাও আবার আসবো।

যাবে তুমি—যাও কিন্তু আবার এসো....তোমার প্রতিক্ষায় প্রহর গুণবো।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

নীলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো নীলার খেয়াল নেই। দরজা খোলার শব্দ হলো, ফিরে তাকাতেই নজরে পড়লো পূর্বের সেই লোকটা রেকাবীতে অনেকগুলো ফলমূল নিয়ে এগিয়ে আসছে।

আজ নীলার চোখে মুখে উজ্জল আনন্দ ঝরে পড়ছে। সে নিজের হাতে অনুচরটির হাত থেকে ফল মূলের রেকাবী নিয়ে টেবিলে রেখে বলে—তুমি যাও।

অনুচরটি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নীলার মুখের দিকে তারপর বেরিয়ে যায়।

নীলা আপন মনেই বলে—থাক, ফলগুলো থাক আমি রেখে দেবো ওর জন্য। আবার আসবে সে তখন ওকে এই ফলগুলো খেতে দেবো। দস্যু বনহুর ওকেও বন্দী করে রেখেছে নিশ্চয়ই ওর কষ্ট হচ্ছে। হয়তো ঠিকমত খেতে পাচ্ছে না।

আজ নীলা তার ঘরখানার চারদিকে পূর্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকালো। এতোদিন সে কোন দিকে প্রাণ ভরে তাকিয়ে দেখিনি। আজ নতুন এক রূপধরা দিলো তার চোখে। আলনায় সাজানো শাড়িগুলোকে সে তুলে নিলো হাতে, খুব সুন্দর শাড়িগুলো।

ড্রেসিং টেবিলে এসে বসলো নীলা—নিজের মুখখানা দেখেনি। এখানে আসার পর সে যত্ন নেয়নি নিজের শরীরের। নীলা স্নানাগারে প্রবেশ করলো। দেহের বসন উন্মোচন করে হাউজের মধ্যে নেমে পড়লো। মনের উজ্জল আনন্দে স্নান সেরে ফিরে এলো কক্ষে।

নতুন শাড়ি পরে নিলো তারপর প্রসাধনি দ্বারা নিজেকে সাজালো সুন্দর করে। আজ বনহুরের এ বন্দীখানাকে তার কাছে স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ আয়নায় তার চেহারার পাশে ভেসে উঠলো একটি জমকালো মূর্তি। মুহূর্তে নীলার মুখখানা অন্ধকারময় হয়ে উঠলো। ফিরে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে ধীরে ধীরে। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর তুমি এসেছো?

বনহুর নীলার পা থেকে মাথা অবধি এক নজরে তাকিয়ে দেখে নেয় তারপর হেসে বলে—চমৎকার।

নীলার মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে উঠে।

বনহুর বলে আবার—আজ যে বড় আনন্দ উজ্জল লাগছে? রংলাল বুঝি আপনার মনের সব ব্যথা বেদনা মুছে নিয়ে গেছে?

নীলা কোনো জবাব দেয় না।

বনহুর বলে—এবার যা কথা দিয়েছিলেন পূর্ণ হোক?

নানা তুমি আমাকে মাফ করো দস্যু বনহুর। তুমি আমাকে মাফ করো।

তা হয় না নীলা। তবে কি কারণে আমি আপনার বাসনা পূর্ণ করবো? আপনি যদি আমার বাসনা পূর্ণ না করেন। যাক আজও আমি আপনাকে রেহাই দিলাম কিন্তু যদি কোন সময় নিজের প্রতি অযত্ন নেন বা ঠিকমত নাওয়া খাওয়া না করেন তবে আবার আসবো—

সেদিন আমি মাফ করবো না।

বনহুর চলে যায় যেমন এসেছিলো তেমনি।

নীলা হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচে।

যতক্ষণ বনহুর তার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলো ততক্ষণ তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিলো। একটা দুর্বলতা তাকে অস্থির করে তুলেছিলো কারণ সে নারী দস্যু বনহুর পুরুষ তবু সাধারণ পুরুষ নয় সে অসীম শক্তিশালী এক ভয়ঙ্কর দস্যু।

নীলার মনের এ দুর্বলতা অহেতুক নয় কারণ সে একজন নারী।

নীলার হৃদকম্প শুরু হয়েছিলো ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক হয়ে আসে। ভাবে দস্যু বনহুরের কথা—লোকে যতই তাকে মন্দ অসৎ বলুক ততখানি সে মন্দ বা অসৎ নয়। মনে পড়ে সেই রাতের কথা হামবার্টের সেই জঙ্গল বাড়ি ঘাটি থেকে কি ভাবে যে তাকে এবং তার পিতা আমির আলীকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলো। শুধু তাই নয় ঐ মুহূর্তে দস্যু বনহুর যদি গিয়ে না পৌঁছাতো তা হলে হামবার্ট তার সতীত্ব বিনষ্ট করে ফেলতো তাতে কোন

সন্দেহ নাই। মনে প্রাণে নীলা দস্যু বনহুরকে তখন ধন্যবাদ জানিয়েছিলো। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কোন কথাই বলেনি। তাছাড়াও দস্যু বনহুর তাকে এবং আব্বুকে এখানে নিয়ে আসার পিছনেও একটা গভীর রহস্য আছে।

দস্যু বনহুর তাকে এখানে নিয়ে আসার পর এমন কোন অসৎ আচরণ করেনি যাতে তার প্রতি একটা ঘৃণা ভাব জন্মাতে পারে। বরং দস্যু বনহুর তার নাওয়া খাওয়া ব্যাপারে বার বার সচেতন রয়েছে। নীলার চিন্তা ধারায় দস্যু বনহুর মহৎ বলে ধরা পড়ে। নীলা আরও ভাবে দুস্য বনহুর তাকে বহুবার একা এবং নির্জনে পেয়েছে ইচ্ছা করলে সে জোর পূর্বক তার বাসনা চরিতার্থ করতে পারতো কিন্তু সে তা করেনি।

নীলা যখন দস্যু বনহুরকে নিয়ে ভাবছে তখন কান্দাই পর্বতমালার তলদেশে গোপন একগুহায় হামবার্ট পায়চারী করে চলেছে। এতো প্রচেষ্টা তার সব ব্যর্থ হয়েছে। জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে তবু দস্যু বনহুরকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। আমির আলীকে সে আটক করে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো সম্ভব হলোনা। নীলাকে বক্ষে ধারণ করে তার কুমনবৃত্তিপূর্ণ করাও হলোনা। হামবার্ট উন্মাদের মত হয়ে উঠেছে। তার কয়েকজন বলিষ্ঠ অনুচরকেও সে এসব কারণে হত্যা করেছে।

হামবার্টের রাগ আরও চরমে উঠেছে কারণ গো লাইসিং মাথাটা রংলালের বলে কেটে এনেছিলো পরে জানতে পেরেছে আসলে সেটা রংলালের নয়! আমির আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ হাসিম কায়েসীর মাথা সেটা।

গোংলাইসিং ভয় পেয়ে ঘাটি ত্যাগ করেছে। সে যখন জানতে পেরেছিলো রংলাল নিহত হয়নি নিহত হয়েছে অপর একজন। তখন গোংলাইসিং আত্মগোপন করে সরে পড়েছিলো কারণ সে জানতো হামবার্ট তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেনা।

গোংলাইসিং আত্মগোপন করে চুপ রইলোনা সে উন্মত্ত হয়ে নীলার সন্ধান করে ফিরতে লাগলো। কোনক্রমে যদি সে নীলাকে নিয়ে হামবার্টের নিকটে হাজির করতে পারে তাহলে হয়তো জীবনে সে বেঁচে যেতে পারে।

সমস্ত কান্দাই শহরে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কখনও মোটর ড্রাইভার। কখনও রিক্সাওয়ালা। কোন সময় ফেরিওয়ালা কখনও সাপুড়ে বা বাদর নাচনেওয়ালা। নাপিত মুচিও হলো সে সুযোগ বুঝে।

একদিন নাপিত বেশে যাচ্ছিল গোংলাইসিং হঠাৎ কজন লোক তাকে ডাক দেয়।

লোকটি অন্য কেহ নয় দস্যু বনহুরের একজন অনুচর। সে গোংলাই সিং এর ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। আমির আলী সাহেবের অনুরোধে সে একটি নাপিত ডেকে এনেছিলো তার চুল কাটবার জন্য।

অনুচর নাপিতটিকে একেবারে আস্তানার ভিতরে নিয়ে না গেলেও তাকে যতটুকু নিয়ে যাওয়া হলো তাতেই সে সব জানতে পারলো।

আমির আলীকে দেখেই তার চোখ দুটো চক চক করে উঠলো। এতোদিন সে যাদের সন্ধান করে ফিরছিলে তাদের সে খুঁজে পেয়েছে। আমির আলীর চুল কাটছিল আর ভাবছিলো নিশ্চয়ই এখানেই কোথাও আছে নীলা।

এক সময় চুল কাটা শেষ করে ফিরে গেলো নাপিত বেশি গোংলাইসিং।

ফিরে গিয়ে অনেক চিন্তা করলো সে কিন্তু কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলোনা। অনেক ভেবে এক সময় হামবার্টের কাছে সব কথা বলাই উচিৎ মনে করলো। কিন্তু হামবার্টের সম্মুখে যাবে সে কেমন করে। প্রথম দর্শনেই তাকে সে হত্যা করে ফেলবে।

হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এলো, নীলাকে যেমন করে হোক চুরি করে নিয়ে যাবে হামবার্টের সম্মুখে—তারপর সবকথা বলবে।

কিন্তু নীলাকে চুরি করাটাই বড় সমস্যা। আমির আলীকে গোংলাইসিং দেখেছে, নীলাকে সে এখনও দেখেনি তবে সে আন্দাজে ধরে নিয়েছে এই বাড়ির ভিতরেই আছে সে।

গোংলাই তাই হামবার্টের কাছে না গিয়ে সব সময় ঐ গলিটার মধ্যে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সুচতুর গোংলাই এর মাথায় বুদ্ধি বেশি ছিলো তাই সে কেমন করে নীলাকে পাবে সেই চিন্তা করতে লাগলো। এক সময় তার মাথায় বুদ্ধি এলো যদি ঐ অনুচরটির বেশে ভিতরে প্রবেশ করা যায় তা হলেই বাস কর্ম ফতে।

একদিন দু'দিন তিন দিন ঐ দরজার দিকে লক্ষ্য রেখে দূরে একটা ডাষ্টবিনের পাশে বসে বসে ঝিমুতে লাগলো। হঠাৎ একদিন তার সাধনা সিদ্ধ হলো, ঐ অনুচরটিকে সে দেখতে পেলো যে তাকে একদিন ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো আমির আলীর মাথা কামাতে।

গোংলাইসিং ঐ অনুচরটিকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। অবশ্য গোংলাই এর শরীরে নাপিতের পোশাক রয়েছে।

অনুচরটি এগিয়ে এলো—আমাকে ডাকছো নাপিত ভায়া?

হাঁ ভায়া শোন।

অনুচরটি এগিয়ে এলো।

গোংলাই সিং তাকে ডেকে আর একটু আড়ালে নিয়ে এলো। দস্যু বনহুরের অনুচর হয়েও সে এতো বুদ্ধিহীন হবে ভাবা যায় না। এই অনুচরটি বয়স তেমন বেশি নয়, কম বয়সী ছেলে মানুষ বলেই তার এ ভুল।

গোংলাইসিং ওকে আড়ালে ডেকে বললো—ভাই সিগারেট খাবে? খুব ভাল সিগারেট....পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বাড়িয়ে ধরলো—ই নাও। সত্যি তুমি আমার ঠিক্ ছোট ভাই-এর মত।

অনুচরটি নাপিতবেশী গোংলাইকে চিনতে পারে না তার মিষ্টি কথায় ভুলে যায় সে। তাছাড়া সিগারেট খেতে দোষ কি সে তো কোন গোপন কথা বলছে না।

অনুচরটি সিগারেটের কয়েক মুখ ধোঁয়া পান করতেই ঢলে পড়ে। এবার গোংলাই তাকে টেনে নিয়ে যায় আড়ালে তারপর ঠিক্ অনুচরটির পোশাক খুলে পরে নেয়। একেবারে সে পাল্টে যায় নিখুঁতভাবে।

বনহুরের অনুচরের বেশে সজ্জিত হয়েও গোংলাই সিং দরজার দিকে এগুতে সাহস পায়না কারণ দরজা কেমন করে খুলতে হয় সে জানেনা।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো তবু কেউ এলোনা যার সঙ্গে সে প্রবেশ করবে ভিতরে।

বসে বসে জিমুচ্ছে সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে হঠাৎ দরজা খুলে যায়, বেরিয়ে আসে একটা লোক।

এউ সুযোগে এগিয়ে যায় গোংলাই সিং গলার স্বর যতদূর সম্ভব বনহুরের অনুচরটির মত করে বলে—ফিরতে বড্ড দেরী হয়ে গেলো...

যে ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো সে বললো—হীরু তুই গিয়েছিলি কোথায় বলতো? এদিকে তোকে খুঁজে হয়রান।

গোংলাই বলে—পথে হঠাৎ আমার চাচার সঙ্গে দেখা তাই একটু... গালপাট্টাটা আরও ভাল করে গালে জড়িয়ে বলে—যা শীত পড়ে গেছে।

চল ভিতরে চল্ কত কাজ পড়ে আছে আর তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

চলো ভায়া চলো।

গোংলাই অনুচরটির সঙ্গে এগিয়ে চললো।

যতই এগুচ্ছে ততই বিস্ময়ে গংলাই এর দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠছে। অন্ধকার দুর্গন্ধময় পঁচাগলির মধ্যে এমন একটি বিরাট বাড়ি। শুধু বাড়িখানাই বিরাট নয়, নানারকম মূল্যবান জিনিস পত্রে সুন্দরভাবে সাজানো।

যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিক থেকে সহসা সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। অপরূপ সব দৃশ্য। যা গোংলাই সিং দেখেনি কোনদিন।

এবার গোংলাইকে যেখানে নিয়ে আসা হলো সেটা হলো পাকশাকের ক্যাবিন্। প্রথম অনুচরটি বললো যা হীরু খান বাহাদুর আর তার মেয়ে নীলার ঘরে খাবার দিয়ে আয়।

গোঙলাই সিং যতদূর সম্ভব নিজের মুখখানাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলো বললো—আচ্ছা যাচ্ছি।

প্রথম অনুচর বললো—ফরিদ তুই হীরুর সঙ্গে যা। একা ও পারবে না দু'ঘরে খাবার দিতে।

হীরুবেশী গোংলাই এর মুখ এতোক্ষণে প্রসন্ন হলো। না হলে তা খান বাহাদুর এবং তার কন্যা নীলার কক্ষ চেনেনা। কোন কক্ষে কে থাকে জানেনা গোংলাইসিং!

গোংলাইসিং আর ফরিদ মিলেই আমির আলী এবং নীলার খাবার নিয়ে চললো।

গোংলাইসিং কথা খুব কম বলছে, বেশি বলতে গেলে হঠাৎ যদি ধরা পড়ে যায়। যদি ফাঁস হয়ে যায় তার সব অভিসন্দি। অবশ্য গো... মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এখানে এসেছে। সে জানে যদি সে ধরা পড়ে তাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য। একটা যাতা কোন জায়গা নয় স্বয়ং দস্যু বনহুরের বাসস্থান, সেটাও গোংলাই আন্দাজে ঠাওর করে নিয়েছে।

গোংলাই সঠিক জানেনা সে কোথায় এসেছে। তবু সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে চলে।

ফরিদ ওকে সঙ্গে করে আমির আলীর কক্ষে খাবার নিয়ে যায় তারপর নীলার কক্ষে।

দরজা খুলে যেতেই গোংলাই এর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠে। নীলাকে দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ শার্দ্দুলের মত হয়ে উঠে সে। মনোভাব অতি সাবধানে দমন করে খাবার রেকাবী টেবিলে সাজিয়ে রাখে।

বেরিয়ে যাবার সময় ফরিদ কি ভাবে দরজা খুললো এবং কি ভাবে বন্ধ করলো সব সে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলো।

রাতে শুয়ে শুয়ে গোংলাই চিন্তা করতে লাগলো এই একটি মাত্র রাত এখন তার হাতে আছে। এই রাতে যদি সে কিছু করতে না পারে তাহলে সব ব্যর্থ হবে এমন কি তার জীবনও বিনষ্ট হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কাল ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে চিনে ফেলবে।

রাত দুটো কিংবা তিনটে হবে। গোঙলাই শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। সে জানে কেউ জাগবেনা কারণ সে এক সময় অতি সতর্কতার সঙ্গে খাবার পানিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলো। সে ছাড়া সবাই পানি পান করেছে। কারো মনে কোন সন্দেহের ছায়া পড়েনি পড়ার কোন কারণ ও ছিলো না।

গোংলাই দিব্য আরামে কক্ষ থেকে বেরিয়ে সোজা সে চলে যায় নীলার কক্ষে। যে ভাবে দরজা খুলেছিলো ফরিদ সেই ভাবে দরজা খুলে ফেলে এবং সে ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পায় নীলা তার বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ডিম লাইটের স্বল্প আলোতে নীলার অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা দেহখানা ঠিক একটি ছবির মতই মনে হচ্ছিলো।

গোঙলাই কিছুক্ষণ নির্নমেষ নয়নে নীলার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করে চললো। হঠাৎ মনে পড়লো নীলা যদি এই মুহূর্তে জেগে উঠে তাহলে সে চিৎকার করবে বা একটা অনর্থ সৃষ্টি করবে। পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে নীলার ঘুমন্ত মুখের কাছে ধরলো।

নীলা মাথাটা একটু নাড়ালো একবার তারপর স্থির হয়ে গেলো তার দেহটা। গোংলাইসিং এবার নীলার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিলো কাঁধে।